সহযোদ্ধা

৫

সহযোদ্ধা

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি'র সাংস্কৃতিক মুখপত্র

সংখ্যা : পুনঃপ্রকাশ নং– ৫
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২০
প্রকাশক : সাংস্কৃতিক বিভাগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, পূবাসপা

দাম : ১০০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৪

ব্যক্তিত্ব– উৎপল দত্ত
ক) উৎপল দত্তের জীবন ও
প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনে তাঁর অবদান– নবারুণ দ্যুতি/৬
খ) উৎপল দত্তের নাটক ও একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন– নবারুণ দ্যুতি/১৫
গ) থিয়েটারের রাজনীতি, রাজনীতির থিয়েটার– কী করা উচিত?
– উৎপল দত্ত/১৯

সাক্ষাৎকার
পিপলস মার্চের সাথে কমরেড লেঙ/৩৩

পুস্তক পর্যালোচনা
অরুন্ধতি রায়-এর "পরমানন্দ" ও আজকের ভারত – চার্বাক/৪৫

গল্প
যে লোকটি এখন বেঁচে আছে– কিষণ চন্দর/৬৪
বন্দুক– কাজল/৭৬

স্মৃতিচারণ
ভাইয়ার শিক্ষা– বেনজির/৭৯

কবিতা
ক) কেউ একজন উড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা– আমিরি বারাকা/৮৩
খ) বৈশাখের ডাক (করোনা কড়চা)– হাসান ফখরী/৯২
গ) গণমুক্তি গেরিলা বাহিনী– আদিত্য/৯৩

গান
ক) আহারে গণমুক্তিবাহিনী/৯৫
খ) সর্বহারা নামে বাংলায়/৯৬
গ) ভেদি অনশন মৃত্যু/৯৭
ঘ) দুনিয়ার মজদুর ভাইসব/৯৮

সম্পাদকীয় :

সহযোদ্ধার এই ৫নং সংখ্যাটি ২০১৫ সালেই তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকাশের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। নানাবিধ জটিলতায় তখন তা আর প্রকাশ করা যায়নি। তারপর সামনে চলে আসে আমাদের পার্টির ৪র্থ জাতীয় কংগ্রেস। ২০১৭ সালে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পর নতুন বোর্ড গঠন হয়। এই বোর্ডের সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন আঙ্গিকে ৫নং সংখ্যার প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। জুন/২০-এ প্রকাশের লক্ষ্যে যখন প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে তখন চলে আসে কোভিড-১৯ মহামারী। লকডাউন চলাকালীন সহযোদ্ধা প্রকাশের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়। লকডাউন তুলে নেওয়ার পরিস্থিতিতে এখন তা প্রকাশ করা হল।

এ সংখ্যায় রয়েছে–

বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজতান্ত্রিক নাট্যতত্ত্ববিদ উৎপল দত্তের রাজনৈতিক জীবন ও সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা। তারই অংশ হিসেবে থাকছে সহযোদ্ধার লেখক নবারুণ দ্যুতির সম্পাদিত উৎপল দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক, যাত্রাপালা ও লেখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। সেইসঙ্গে নাটকের ওপর উৎপল দত্তের লেখা প্রবন্ধ। এখানে চল্লিশের দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত বিশ্বের ও ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে ঐতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শিক লড়াইয়ে প্রগতিশীল, বিপ্লবী শিক্ষা গ্রহণের বিচার পদ্ধতি উঠে এসেছে। যে সব মৌলিক শিক্ষা বর্তমান বিপ্লব ও বিপ্লবীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

লকডাউনের অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে লেখা সহযোদ্ধার নিয়মিত লেখক চার্বাকের অরুন্ধতী রায়ের আলোড়িত উপন্যাস 'দ্যা মিনিস্ট্রি অব আটমোস্ট হ্যাপিনেস' এর পর্যালোচনা। এখানে বর্তমান সময়ে অরুন্ধতী রায়ের মতো সাহসী সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ বিরোধী প্রাজ্ঞ, সমসাময়িক প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শিল্প-সাহিত্য নির্মাণে সিদ্ধহস্ত অরুন্ধতী রায়ের অগ্রসর অবস্থানগুলোকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করে প্রশংসা করা হয়েছে। অন্যদিকে মা-লে-মা'র অবস্থান থেকে সমাজতন্ত্র ও মাওবাদী গণযুদ্ধের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কিছু সমালোচনাও রয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) এর সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান কমরেড লেঙের সাক্ষাৎকার। যেখানে রয়েছে কিভাবে গণযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলে

বিপ্লবী গণসংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন কিভাবে গণযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখে তার জীবন্ত উদাহরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। যা বর্তমান সময়ে গণুদ্ধের লাইন অনুসরণকারী সকল বিপ্লবীদের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় বৃটিশ শাসনের শেষদিকে ১৯৪২/৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উর্দু কথাসাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের কালজয়ী উপন্যাস "অন্নদাতা" থেকে নেওয়া একটি গল্প ছাপা হল। যা আজকের করোনা মহামারীতে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালাল শাসক-বুর্জোয়াদের মুর্খতা, অযোগ্যতা, নির্মমতা, দেশদ্রোহীতা, মুনাফাবাজি, অমানবিকতা, দুর্নীতিকে শৈল্পিক উন্মোচনে প্রেরণা সঞ্চার করবে।

আমেরিকার বর্ণবাদ বিরোধী কবি আমিরি বারাকার সাড়া জাগানো কবিতা 'কেউ একজন উড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা'। যেখানে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অপকর্মের ঐতিহাসিক বয়ান। এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিকামী জাতি-জনগণ ও তাদের সংগ্রামের বীর নায়কদের প্রতি সশ্রদ্ধ উচ্চারণ।

এছাড়া রয়েছে পার্টির নতুন, পুরাতন লেখকদের গান, গল্প, স্মৃতিচারণ, কৌতুক ও কবিতা। পার্টির বাইরের প্রগতিশীল একজন লেখকের কবিতাও রয়েছে।

করোনা বিষয়ে আলাদা কোনো রচনা দেওয়া হল না। করোনার ওপর পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পর্যালোচনা-গবেষণা-কর্মসূচি ও গাইডমূলক তিনটি সিরিজ, কেন্দ্র অঞ্চল ও বিভিন্ন বিভাগের লিফলেট, বিবৃতি প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত গণযুদ্ধ বুলেটিনেও এ সম্পর্কিত লেখা রয়েছে। সহযোদ্ধা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন করোনা মহামারীর ২য় প্রবাহ শুরু হতে চলেছে। যা শীতকালে শ্রমিক, কৃষক সহ নিম্ন আয়ের জনগণের জীবনে নতুনতর মহাসংকটের আকারে দেখা দিতে পারে। এই সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে দলিল প্রকাশিত হয়েছে/হবে। সেগুলো যথাসময়ে সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করতে হবে। দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সবশেষে সহযোদ্ধাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত প্রকাশ ও মানসম্মত করার জন্য পার্টির সকল কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক লেখক-পাঠকগণকে 'সহযোদ্ধা সম্পাদনা বোর্ড' এর দপ্তরে মতামত, সমালোচনা ও নতুন নাটক-সিনেমা-সাহিত্য রচনা ও পর্যালোচনা, প্রবন্ধ, গান, গল্প, ছড়া, কবিতা, কৌতুক লিখে পাঠানোর আহবান করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে সহযোদ্ধার তহবিল সচল রাখার জন্য বিশেষ সহযোগিতা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

উৎপল দত্তের জীবন ও প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনে তাঁর অবদান

– নবারুণ দ্যুতি

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি বিশেষত নাট্যআন্দোলনের প্রধান সারির এক প্রতিভাবান প্রগতিশীল শিল্পীর নাম উৎপল দত্ত। তিনি কেবল নট, নাট্যকার, নির্দেশক, গবেষক, চিন্তাবিদই ছিলেন না, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে শোষণহীন-বৈষম্যহীন সমাজ সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে আমৃত্যু দৃঢ়ভাবে প্রচার করেছেন। পুলিশী নির্যাতন, কারাবাস, গুন্ডাবাহিনী দিয়ে তাঁর নাটকের উপর রাষ্ট্রের আক্রমণ, ... কোনো কিছুই থামাতে পারেনি এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে। তিনি ভারতের মহান নকশালবাড়ী আন্দোলন ও একইসাথে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই(এম.এল.) প্রতিষ্ঠাকালে যুক্ত ছিলেন। যদিও অভিজাত শিক্ষিত শহুরে জীবন থেকে এসে মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষা ও গণযুদ্ধের বিপ্লবী রাজনীতির উত্থান-পতনে নিজেকে তদনুযায়ী পুনর্গঠন করতে পারেননি। বরং আন্তঃপার্টি সংগ্রামের আকাঁবাঁকা পথে মালেমা'র তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে অগ্রসর বিপ্লবী রাজনীতির ঝান্ডাকে তুলে ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়েছেন, পিছু হটেছেন। মাও পরবর্তী পুঁজিবাদের পথগামী চীন (বর্তমানে সামজিক সাম্রজ্যবাদী) এবং কিউবা, ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের ব্যানারে জাতীয়তাবাদী সংস্কারকে মালেমা'র বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি শেষ পর্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। আজ, একুশ শতকের বিপ্লবী রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্যকে গড়ে তোলা ও এগিয়ে নেওয়া আমাদের এক অপরিহার্য কতর্ব্য। উৎপল দত্তের মতো প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের অবদানকে মালেমা'র ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা তারই অংশ। কেননা সমাজতন্ত্রের জন্য নিবেদিত প্রাণ, আজীবন সংগ্রামী এধরনের সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ও প্রতিভা কিছু রাজনৈতিক ভুল ও বিভ্রান্তি করলেও নিপীড়িত জাতি-জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে প্রেরণা সঞ্চার করাই ছিল তার মূল কর্তব্য। এজন্য তাঁর জীবনী, রচনা, নাটক, সিনেমা ও যাত্রাপালা

দেখা ও অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যাতে তাঁর ইতিবাচক অবদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং একইসাথে ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত করা যায়। সে লক্ষ্য থেকেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যের উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং থিয়েটারের উপর তাঁর একটি লিখিত বক্তৃতা প্রকাশ করা হল।

উৎপল দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাংস্কৃতিক কর্ম

বাল্যকাল

পুরো নাম উৎপল রঞ্জন দত্ত। জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তনখোলায়। বাবা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মা শৈলবালা রায়ের (দত্ত) পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ সন্তান। বাবা গিরিজারঞ্জন ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ প্রভাবিত সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। তিনি পরবর্তীকালে জেলার হিসেবে ইংরেজ কারাগারে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত হন। উৎপলের স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল শিলং শহরের সেন্ট এডমন্ডস স্কুলে। পরে বাবা গিরিজারঞ্জন বদলি হয়ে আসেন বহরমপুর শহরে। এখানেই উৎপলের ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছিল। ছোট ভাই নীলিন ও তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের ভয়ে স্কুলে যাতায়াতের সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেহরক্ষী থাকত। জেলের পাঠান রেজিমেন্টের জওয়ানদের সঙ্গে উৎপল ড্রিল করতেন। এই সঙ্গই তাঁকে সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছিল। জেল-সংলগ্ন কোয়ার্টারে সপরিবার তাঁরা থাকতেন। বাড়িতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশে শেক্সপিয়রের উপস্থিতি ছিল অগ্রগণ্য। মেজদা মিহিররঞ্জন কিশোর উৎপলকে শেক্সপিয়রের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতেন। বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চল ছিল। উৎপল সে সব নাটক মন দিয়ে শুনতেন। তাই তিনি মাত্র ছয় বছর বয়সেই শেক্সপিয়রের নাটকের সংলাপ মুখস্থ বলতে পারতেন। বড়দিদির মাধ্যমে হিন্দুস্তানী মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় বহরমপুরের বাড়িতেই। আরও পরে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসেন।

কলেজ জীবন

১৯৩৯ সালে গিরিজারঞ্জন কলকাতায় বদলি হলে দত্ত পরিবার দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত রয় স্ট্রিটে থাকতে শুরু করে। কলকাতায় আসার পরেই উৎপল বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন "মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের প্রযোজনার আমি তো নিয়মিত ভক্ত ছিলাম। আর অবশ্যই শিশির ভাদুড়ি মহাশয়ের শ্রীরঙ্গমের অভিনয়গুলি। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে তাঁর অভিনয় লক্ষ্য করতাম। সেইসব মহৎ কারবার দেখে মনে হল,

আমার পক্ষে অভিনেতা ছাড়া আর কিছুই হবার নেই।" তার বয়স তখন তেরো। বিশ্বজুড়ে তখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সেই আবহাওয়ায় দশ বছর বয়সের উৎপল ভর্তি হলেন সেন্ট লরেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে। স্কুলে বিদেশি নাটক হতো।

উৎপল অভিনয় করতেন। এর পরে তিনি চলে আসেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, নবম শ্রেণিতে। এই স্কুল ও কলেজ জীবন উৎপল দত্তকে তৈরি করে দিয়েছিল। ১৯৪৫-এ তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলেজে তাঁর কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ছিল গ্রন্থাগারটি। বিভিন্ন বিষয়ের বই তাঁর সামনে মেলে ধরেছিল জ্ঞানের বিপুল ভান্ডার।

ওই বয়সেই সে শেক্সপিয়রের জগৎকে যেমন আবিষ্কার করেছিল, তেমনি মার্কস, লেনিন, স্তালিন, হেগেল, কান্টও তাঁর আয়ত্তে ছিল। কলেজে ইউরোপীয় নাট্যচর্চার একটা ধারা আগে থেকেই সজীব ছিল। এখানে পড়াকালীনই একদিকে যেমন ইবসেন বা শেক্সপিয়রের নাটকের জগৎ তাঁর আরও কাছে এসেছিল, তেমনি সেই নাটকে অভিনয় করার নেশা। কলেজ পত্রিকার জন্য তিনি বেটি বেলশাজার নামে প্রথম ইংরেজি নাটক লিখেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেন। সেখানে যেমন ছিল শেক্সপিয়র, বার্টান্ড রাসেল, রুশ সাহিত্য তেমনই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র.... বেঠোভেন, বাখ, গুবার্ট ও ভাগনারেরর মতো সুরস্রষ্টারাও বাদ যাননি। পরবর্তীকালে তাই থিয়েটারে সংলাপের পরে সঙ্গীতের প্রয়োগই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

১৯৪৭ সালে নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড'-এ অভিনয়ের মধ্যদিয়ে কলেজ জীবনে উৎপলের নাট্য অভিনয়ের শুরু। তাঁর সহপাঠী অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ রায়, অনিল চট্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বন্ধুদের নিয়েই তিনি তৈরি করেন তাঁর প্রথম নাট্যদল 'দি অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ন্স'। তখন তাঁর বয়স আঠারো। যদিও ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে 'নবনাট্য আন্দোলন'-এর জন্ম দেওয়া 'নবান্ন' নাটকটি তিনি দেখেছেন ও চমকে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের বৃত্তেই তখন তৈরি হচ্ছিলেন সেই নবনাট্যর এক স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করার জন্য। কারণ দিন বদলের দামামা উৎপল ততদিনে শুনে ফেলেছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের সময়কালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চারের দশক জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুদের ঢল, গণনাট্য, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদিতে সারাদেশ উত্তাল। সেই রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ উৎপলকে বাধ্য করেছিল মার্কসের দর্শনকে নাট্যমঞ্চে প্রয়োগের স্তরে নিয়ে আসতে। ১৫ জুলাই ১৯৪৯ জেভিয়ার্সের মঞ্চে তিনি শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' উপস্থাপন করলেন চরিত্রদের ইতালীয় ফ্যাসিস্ট শাসকের পোশাক পরিয়ে। সমকালীন মাত্রা পেল শেক্সপিয়রের নাটক। জিয়োফ্রে কেন্ডাল ও শেক্সপিয়রানা নাট্যদল সেন্ট জেভিয়ার্সে থাকাকালীনই শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড'-এ উৎপলের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের দলে টেনে নেন জিয়োফ্রে কেন্ডাল। 'দ্য শেক্সপিয়রানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' তে অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন উৎপল। প্রথম পর্বে কলকাতা ও দ্বিতীয়পর্বে সারাদেশ ঘুরে তিনি এই দলের পেশাদার অভিনেতা হিসেবে শেক্সপিয়রের মোট আটটি নাটকে অভিনয় করেন। জিয়োফ্রেকে শিক্ষাগুরু মনে করতেন উৎপল। শেক্সপিয়রের নাটকে ঠিক কিভাবে অভিনয় করতে হয়, নাটকের দল বলতেই বা কী বোঝায়, তা তাঁকে হতে কলমে শিখিয়েছিলেন জিয়োফ্রে। এই নাট্যদলে কাজ করার সময়ে জেনিফার কেন্ডালের প্রেমে পড়েছিলেন উৎপল। কিন্তু সে সম্পর্ক বেশিদিন

টেকেনি। জেনিফারকে একজন ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী বলে মনে করতেন উৎপল । তাই পরবর্তী জীবনে শশী কাপুরের সঙ্গে জেনিফারের বিয়ে ও অভিনয় ছেড়ে দেওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি।

গণনাট্য সংঘ

শেক্সপিয়রানা দলের হয়ে অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' নাট্যদলের হয়েও অভিনয় করে যাচ্ছিলেন উৎপল। ১৯৪৯ সালে এই দলের নাম বদলে হয় 'কিউব'। ১৯৫০-এ ইউরোপ ও আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আবারও দলের নাম বদলে করেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। ১৯৫২ সালে এই দলে যোগ দেন রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা। এরপরই বাংলা নাটকের দল হিসেবে 'এল টি জি' পাকাপাকিভাবে আত্মপ্রকাশ করে হেনরিক ইবসেনের বাংলা অনুবাদ 'গোস্টস' নাটকটি দিয়ে। একসময় উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গননাট্যের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আরো অনেকের মতো বিরক্ত হয়ে তিনিও বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গননাট্যই তাঁকে শিল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রথম পাঠ শিখিয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। উচ্চবিত্ত পারিবারিক পটভূমি, ইঙ্গবঙ্গীয় থিয়েটারের অভিজ্ঞতা, কেতাদুরস্থ ইংরেজি, ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যে ভরপুর আপাদমস্তক 'সাহেব' নাট্য পরিচালক ও নট উৎপল তাঁর যাবতীয় প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে এসে সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে থেকেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন লাল দুর্গের এক অতন্দ্র প্রহরী। গণনাট্য সংঘের হয়ে তিনি পানুপালের 'ভাঙা বন্দর', ইবসেনের 'পুতুলের সংসার', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', গেগোলের 'রেভিজর' অবলম্বনে 'অফিসার', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'চার্জশীট', পানু পালের 'ভোটের ভেট', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' ও শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

এল টি জি প্রতিষ্ঠা ও পথনাটক

উৎপল দত্ত হলেন বাংলা পথনাটকের পথিকৃৎ। তাঁর মতে , "পথনাটিকা হচ্ছে সেই মাধ্যম যেখানে লক্ষ মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিনেতার রাজনৈতিক উপলব্ধি এক হয়ে বিস্ফোরিত হয় মঞ্চে"। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণির হাত ধরেই এর উঠে আসা । ১৯৫১ সালে উমানাথ ভট্টাচার্যের এক রাতের মধ্যে লেখা 'চার্জশীট' ভারতীয় গণনাট্যের প্রথম পথনাটক। যা অভিনীত হয়েছিল হাজরা পার্কে। যেখানে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, মমতাজ আহমেদ ও পানু পাল। দীর্ঘ একচল্লিশ বছরে উৎপল দত্ত মোট ২৫টি পথনাটক করেছিলেন কখনও কোনো কারখানার গেটে, নির্বাচনী জনসভায় বা বন্দীমুক্তি আন্দোলনে উত্তাল বাংলার

বিভিন্ন মাঠে ময়দানে। এই প্রযোজনাগুলি হয়েছিল গণনাট্য ও 'উৎপল দত্ত সম্প্রদায়'-এর নামে। পথনাটকে অভিনয়ের সুযোগ তাঁকে করে দিয়েছিল গণনাট্য সংঘ।

পেশাদার নাট্যকর্মী , লেখক, সংগঠক ও পরিচালক

এই সময়কালে উৎপল দত্ত পেশাদার নাট্যমঞ্চ গড়ে নিয়মিত থিয়েটার করে যাওয়ার বাসনায় মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়ে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার থিয়েটার করতে শুরু করেছিলেন। প্রথম দিকে আগে অভিনীত 'ওথেলো', 'ছায়ানট' ও 'নীচের মহল' দিয়ে শুরু হলেও পেশাদার নাট্যমঞ্চের দর্শক তেমনভাবে সাড়া দেয়নি। এই সময়ে উৎপল দত্তের ব্যক্তিগত জীবনও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল। আর্থিক সংকটে জর্জরিত। মিনার্ভা হলের তিনতলার ঘরটাই ছিল তাঁর বাসস্থান। ততদিনে পেশাদার অভিনেতা হওয়ার তাগিদে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চাকরিটিও ছেড়েছেন। অন্যদিকে সহ অভিনেতা শোভা সেনের সঙ্গে তাঁর স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। যার প্রভাব পড়ছিল উৎপল দত্তের জীবনেও। পরবর্তী কালে উৎপল ও শোভা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৬১-তে জন্মায় তাঁদের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

এল টি জি'র সদস্যরা মিনার্ভা ও অন্যান্য মঞ্চে নাটক করে যাচ্ছিলেন। এমনি এক সময়ে ধানবাদ অঞ্চলের জামাডোবায় চিনাকুড়ি ও বড়াধেমো কয়লাখনিতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। খাদে আগুন ধরে যায়। মালিক আটকে পড়া শ্রমিকদের কথা না ভেবে জল ঢুকিয়ে খনি বাঁচাতে চেষ্টা করেন। শ্রমিকরা মারা যান। এই দুর্ঘটনার খবর রবি ঘোষ তাঁর এক আত্মীয় মারফত নিয়ে আসেন উৎপলের কাছে। খবর পেয়েই তিনি ছুটে যান সেই কয়লাখনিতে। সঙ্গে তাপস সেন, নির্মল গুহ রায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, রবি চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। হাজার ফুট নিচের সেই খনি গহ্বরে তাঁরা দু'ঘন্টা ধরে ঘুরে বেড়ান। জীবিত খনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। খনির ভিতরের বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করেন। তারপরে সেখান থেকে ফিরে মিনার্ভার তিনতলার ঘরে বসে টানা ১৫ দিনে লিখে ফেলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। ১৯৫৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই নাটক প্রযোজনার কাহিনি আজ বাংলা নাট্যজগতে মিথে পরিণত হয়েছে। এর পরে এল টি জি নাট্যদলকে আর পিছনে ফিরতে হয়নি। উৎপল দত্ত তার পর থেকে 'গালিভারের' মতোই বিচরণ করেছেন বাংলার নাট্যজগতে। এইভাবেই ক্রমশ মিনার্ভায় ফেরারী ফৌজ, তিতাস একটি নদীর নাম, চৈতালী রাতের স্বপ্ন, প্রফেসর, মামলক ইত্যাদি নাটক পার হয়ে ১৯৬৫ সালের ২৮ মার্চ মঞ্চস্থ হয়েছিল আর এক সাড়া জাগানো নাটক 'কল্লোল'। ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই নাটক বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের সূচনা করেছিল তা আজও নজিরবিহীন। উৎপল দত্তের বয়স তখন ৩৬। স্বাভাবিক কারণেই

'কল্লোল'-এর বিরুদ্ধে সরকারি ক্রোধ নেমে এসেছিল। পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে নাটকটি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বলা হয়েছিল, মিনার্ভা থিয়েটার 'কমিউনিস্টদের বেলাল্লাপনার আখড়া'য় পরিণত হয়েছে। এই নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপা নিষিদ্ধ করেছিল তৎকালীন কলকাতার প্রায় সব খবরের কাগজ। ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ভারত রক্ষা আইনে উৎপল দত্তকে গ্রেফতার করে জেলবন্দী করা হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে সরব হয়েছিলেন শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা। কলকাতার রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পর ৭ মে ১৯৬৬ ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল 'কল্লোল বিজয় উৎসব'।

মাওবাদী আন্দোলনে যোগদান ও বিচ্ছেদ

মহান নকশালবাড়ী আন্দোলনে সশস্ত্র উত্থানে উৎপল দত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের অনুসারী সিপিআই ও মাও-ক্রুশ্চভ প্রশ্নে মধ্যপন্থী সিপিএম-এর সংশোধনবাদী লাইনকে বর্জন করে কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে প্রথমে কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পরে সি পি আই (এম এল)'র মাওবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালে রচনা করেন 'তীর' নাটক। এ সময়ে তাঁর নামে আবারও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুম্বাই শহর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময়ে তিনি আর রাজনৈতিক নাটক না লেখার শর্তে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়েছিলেন বলে জানা যায়। চীনের 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর অনুসরণে ভারতের মাওবাদীরা মূর্তি ভাঙা আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি সেই আন্দোলনের সমালোচনা করেন। এসব কারণে তখন তিনি মাওবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মাওবাদী রাজনীতি থেকে সরে আসার পর উৎপল দত্ত রাজনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। নিজের দল এল টি জি তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। সেই নিঃসঙ্গতা ও সংকট মুহূর্তে তিনি মঞ্চস্থ করেন 'মানুষের অধিকার' নামে আরেকটি কালজয়ী নাটক। এই নাটককে মাওবাদী বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। তার প্রভাব এসে পড়ে 'এল টি জি' দলের মধ্যে। সাত সদস্য দলত্যাগ করেন। উপদলের জন্ম হয়। ফলে ১১ বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া একটি অন্য ধারার পেশাদার থিয়েটারের ইতি ঘটিয়ে উৎপল দত্ত মিনার্ভা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গড়ে তোলেন 'বিবেক নাটসমাজ', যা পরবর্তীকালে নতুন দল 'পিপলস লিটল থিয়েটার' বা 'পি এল টি' নামে পরিচিতি পায়। ১৯৭১ সালের ১২ অক্টোবর রবীন্দ্র সদনে হয় দলের প্রথম নাটক 'টিনের তলোয়ার'। এই নাটকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসটি সুন্দরভাবে ধরা পড়লেও 'অশ্লীল' ঘোষিত হওয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর পরে সূর্যশিকার, ব্যারিকেড, টোটা, দুঃস্বপ্নের

নগরী, তিতুমীর, স্তালিন–১৯৩৪, লালদুর্গ, জনতার আফিম, পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন 'একলা চলো রে' নাটকে । যে নাটকে তিনি শেষবারের মতো মঞ্চে নামেন।

রাজনৈতিক যাত্রাপালা

স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখটের অনুসারী উৎপলের কাছে যাত্রা ছিল মানুষের মাঝে পৌঁছানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। শহুরে প্রসেনিয়াম ছেড়ে তিনি যেমন রাস্তায় নেমে নাটক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তেমনি যাত্রার মঞ্চকে ব্যবহার করে বাংলার গ্রাম-গঞ্জের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় পা রেখেছিলেন। নিউ আর্য অপেরার হয়ে 'রাইফেল' পালার মধ্য দিয়ে তিনি পেশাদার পালাকার ও পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৮ অবধি সফল পালাকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত ছিলেন চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার একচ্ছত্র অধিপতি।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রে অভিনয় উৎপল দত্তের জীবনে কিভাবে কাজে লেগেছে এই বিষয়ে তিনি বলেন, "নাটক ও যাত্রা আমাকে সৃষ্টির আনন্দ দিলেও চলচ্চিত্র দিয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ, মানে টাকা।" সেইসঙ্গে হিন্দী চলচ্চিত্র তাঁকে সর্বভারতীয় অভিনেতা হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। মধু বসুর 'মাইকেল' ছবিতে মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্তর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা। অসংখ্য বাংলা, হিন্দি বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করলেও তাঁর নিজের ভাললাগার ছবিগুলো তৈরি হয়েছিল অজয় কর, তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শক্তি সামন্তর মতো পরিচালকের ছবি দিয়ে। বড় মাপের কৌতুক অভিনেতা হিসেবে তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে আছে এঁদের ছবিতে। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' তাঁকে চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তবে যাঁর ছবিকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি সত্যজিৎ রায়। 'পথের পাঁচালী ' বা 'জনঅরণ্য' দেখে সত্যজিৎকে লেখা তাঁর আবেগরুদ্ধ চিঠি রয়েছে। সত্যজিৎও মুগ্ধ ছিলেন উৎপলের প্রতিভায়। বলেছিলেন, "উৎপল যদি রাজি না হত, তবে হয়তো আমি 'আগন্তুক বানাতামই না।" 'আগন্তুক' ছবিতে উৎপলকে নিজের প্রতিভূ হিসেবেই ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ।

শেষ জীবন

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উৎপল দত্ত বিশ্বের সেরা শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞদের অন্যতম ও একজন প্রগতিশীল বামপন্থী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট ৬৪ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

উৎপলদত্ত রচিত নাটক ও পালা

উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে অঙ্গার (১৯৫৯), কল্লোল (১৯৬৫), তীর, টিনের তলোয়ার, মানুষের অধিকার ইত্যাদি। তাঁর নাটকগুলিকে ৩ ভাগে ভাগ

করা যায়। পূর্ণাঙ্গ নাটক, পথনাটক, যাত্রাপালা। ছায়ানট (১৯৫৮), অঙ্গার (১৯৫৯), ফেরারী ফৌজ (১৯৬১), ঘুম নেই (১৯৬১), মে দিবস (১৯৬১), দ্বীপ (১৯৬১), স্পেশাল ট্রেন (১৯৬১), নীলকণ্ঠ (১৯৬১), ভিআইপি (১৯৬২), মেঘ (১৯৬৩), রাতের অতিথি (১৯৬৩), সমাজতান্ত্রিক চাল (১৯৬৫), কল্লোল (১৯৬৫), হিম্মৎবাঈ (১৯৬৬), রাইফেল (১৯৬৮), মানুষেরঅধিকার (১৯৬৮), জালিয়ানওয়ালাবাগ (১৯৬৯), মাও-সে তুং (১৯৭১)

পালা : সন্ন্যাসীর তরবারি (১৯৭২), বৈশাখী মেঘ (১৯৭৩), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), সীমান্ত, পুরুষোত্তম, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, জনতার আফিম, পান্ডবের অজ্ঞাতবাস, মধুচক্র, প্রফেসর, মামালক, শেময়ে মালিক, সমাধান, অজেয় ভিয়েতনাম, তীর, ক্রুশবিদ্ধ হবা, নীলরক্ত, লৌহমানব, যুদ্ধংদেহি, লেনিনের ডাক, চাঁদের কৌটো, রক্তাক্ত, ইন্দোনেশিয়া, মৃত্যুর অতীত, ঠিকানা, টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড, মহাবিদ্রোহ, মুক্তিদীক্ষা, সূর্যশিখর, কাকদ্বীপের এক মা, ইতিহাসের কাঠগড়ায়, কঙ্গোর কারাগারে, সজনামিক, নয়াজমানা, লেনিন কোথায়, এবার রাজার পালা, স্তালিন-১৯৩৪, তিতুমির, বাংলা ছাড়ো, দাঁড়াও পথিকবর, কৃপাণ, শৃঙ্খল ছাড়া, মীরকাসিম, মহাচীনের পথে, আজকের শাহজাহান, অগ্নিশয্যা, দৈনিক বাজার পত্রিকা, নীল সাদা লাল, একলা চলো রে, লাল দুর্গ, বণিকের মানদন্ড, এংকোর (অনুবাদ গল্প)।

উৎপল দত্তের নাটক ও একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

– নবারুণ দ্যুতি

উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাটকে শাসক, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সরাসরি। শুধু তাই নয়, নাটক নিয়ে তিনি চার দেয়ালে ঘেরা থিয়েটারে আবদ্ধ থাকেননি, পৌঁছেছেন গণমানুষের কাছে; নাটকে সম্পৃক্ত করেছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে। তাঁর নাটকে শ্রেণিচেতনা ও ইতিহাস চেতনার প্রতিফলন রয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতির পাশাপাশি উঠে এসেছে বিশ্ব রাজনীতি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, মানবতার জয়তু জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিষয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণ-বিপ্লবের কাহিনী তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়বস্তু। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সন্ন্যাসবিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক অধ্যায়, ভারতের নৌ বিদ্রোহ, দেশবিভাগের মর্মন্তুদ ঘটনা ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের মরণপণ সংগ্রামী ঘটনাগুলিও তাঁর নাটকে ধরা পড়েছে গভীর ইতিহাসবীক্ষার আলোকে। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রগঠনের যে ঘটনা আজও সর্বহারা শ্রেণির চোখের মণি সেই প্যারি কমিউন, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তরকাল, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম, চীনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কলঙ্কজনক ভূমিকা– সবই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে।

শোষণ থেকে মুক্তি ও নিপীড়িত জাতি-জনগণের বিদ্রোহ-বিপ্লব ও সংগ্রামের প্রতি উৎপল দত্ত সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার কাছে প্যারি কমিউন, সোভিয়েত, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার যোদ্ধারা তিতুমীর পরিচালিত বীর সেনানীদের উত্তরসূরি। এক্ষেত্রে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ এর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। সেই সত্যই তাঁর কাছে জীবনসত্য বা শ্রেণিসংগ্রামের প্রেক্ষিতে বিচার্য। এই বিশ্বাসই তিনি নাটকে প্রয়োগ করেছেন।

ইতিহাস আশ্রিত নাটকগুলোর মধ্যে ‘কল্লোল’, ‘ব্যারিকেড’, ‘একলা চলোরে’, ‘জনতার আফিম’, ‘তিতুমীর’, ‘সন্ন্যাসীর তরবারি’, ‘ক্রুশবিদ্ধ কুবা’, ‘টোটা’, ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ উল্লেখযোগ্য। ভারতের ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ নিয়ে লেখা ‘কল্লোল’ উৎপল দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাটক। এই নাটকের মধ্যদিয়ে তিনি ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহ

নতিস্বীকার করেছিল। কিন্তু 'কল্লোল' নাটকে তা করেনি। কারণ সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বৈপ্লবিক। তিনি বলেন, "যুদ্ধজাহাজ 'খাইবার' যে আত্মসমর্পণ করেছিল এটা কেবলমাত্র একটা ঘটনা, এটাই সত্য নয়। খাইবার যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল সত্য তাকে নিয়েই। বুর্জোয়াদের জেদ– যা দেখবে তাই লিখতে হবে, ঠিক যেমনটি আছে। ম্যাক্সিম গোর্কি ও বার্টোল্ট ব্রেখট এই উভয়ের কথা: যা আছে শুধু তাই সত্য নয়, যা হবে, যা হওয়া উচিত তাও সত্য।"

'৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ-ভারতে এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন বিদ্রোহে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্বতঃসিদ্ধভাবে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ চক্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করতে বাধ্য করেছিল। ভারতীয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণি সেই নৌ-সেনা ও নিপীড়িত জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের উত্থানের দুঃস্বপ্নে আজও ভীত। প্রকৃত ইতিহাসে দেখা যায় বল্লভ ভাই প্যাটেল ও মোহম্মদ আলী জিন্নাহ নাবিকদের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নাবিকদের বন্দি করেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে তাদের তুলে দিয়ে সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অন্যতম শরীক হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এর কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনায় দেশভাগের লাভালাভ নিয়ে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে এই দুই নেতাই তখন ব্যস্ত ছিল। সেজন্য নরম ভাষায় বিদ্রোহের বিরোধিতা মূলত আত্মসমর্পণের জাল তৈরি করেছিল। কংগ্রেসের এই দেউলিয়া রাজনীতি নাটকে স্পষ্ট। 'কল্লোল' নাটক একটি বিশেষ যুগকে ধরে রেখে সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। ঐ বিশেষ যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চেহারার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকের সর্বত্র।

'একলা চলোরে' নাটকে দেখা যায় বিনা রক্তপাতে তথাকথিত স্বাধীনতায় যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে তাদের দ্বারা প্রকৃত গান্ধীবাদীদের ওপর নিপীড়ন। যে সকল ভূস্বামী, জমিদার, মহাজন স্বাধীনতার মুনাফা বেশি লুটেছে তারাও কংগ্রেসী। মুনাফার তাগিদে নির্লজ্জভাবে হিন্দু চাষী এবং মুসলমান চাষী আখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন তারাই যুগিয়েছে। নাট্যকার দেখিয়েছেন স্পষ্টভাবে শান্তি ও ক্ষমার প্রতীক সত্যাগ্রহী কংগ্রেসী পিতাও রেহাই পায়নি ব্রিটিশ রাজশক্তির পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে, যখন তারা জানতে পেরেছে যে তার পুত্র ব্রিটিশের মুলোচ্ছেদে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। পুত্র সহিংস বলে অহিংস পিতাকে ক্ষমা করেনি। 'রাইফেল' নাটকের বিষয়বস্তু ত্রিশ থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত। ১৯৩৪ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বিপ্লবীদলের যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেটাকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন এখানে। আন্দোলন নিয়ে বিপ্লববাদী ও গান্ধীবাদীদের মধ্যে যে মতদ্বৈততা ছিল তাকে নাট্যকার রূপায়িত করেছেন অসাধারণ নাট্যশৈলিতে। তাই নাটকের শুরুতেই নাট্যকার সূত্রধর চরিত্রের মাধ্যমে সেই প্রশ্নই তুলে ধরেছেন- "কান পেতে শুনুন, চারিদিকে ঢক্কা নিনাদ, দেশ স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে,

অহিংস সংগ্রামের দৌলতে। দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে খদ্দর পরার ফলে, আমরা একমনে চরকা কেটেছি বলে।

অহিংস সংগ্রামের ফলে দেশ স্বাধীন? তবে কি ক্ষুদিরামের নাম মুছে ফেলা হবে ইতিহাস থেকে? বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন? তবে কি সূর্যসেনের রক্ত রক্ত নয়? তবে কি ঝাঁসির রানী লক্ষীবাই আর তিতুমীর, আর এ যুগে নৌ-বিদ্রোহী আর সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র আই. এন. এ বাহিনী আমাদের কেউ নয়? এই সংলাপের মধ্যদিয়ে নাট্যকার দেখান পরাধীন ভারতে যারা দোসর ছিল তারাই '৪৭ পরবর্তী ভারতে ক্ষমতায় বসে। তিনি দেখাতে চান যে, পরাধীন ভারতে বৃটিশরা যেমন সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাত, শাসন-শোষণ করত ঠিক তেমনিভাবে শোষণ নির্যাতন করে 'স্বাধীন' দেশের কংগ্রেসীরা। কংগ্রেসী স্বাধীনতাকে নাট্যকার স্বাধীনতা বলতে নারাজ। সেটা শুধু ক্ষমতার পালাবদল। নাটকের শেষে তাই বিপ্লবীরা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে। লুকিয়ে রাইফেল নিয়ে তারা আবার ঘুরে দাঁড়াতে চায়। নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন অস্ত্রছাড়া বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জেতা সম্ভব নয়। তাই রাইফেল হয়ে ওঠে গণমানুষের হাতিয়ার।

'ফেরারী ফৌজ' নাটকে নাট্যকার ১৯৪৭ পূর্ব ভারতবর্ষের রাজনীতি ও আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। বাংলার আন্দোলনের ইতিহাসে যা অগ্নিযুগ নামে পরিচিত সেই যুগটি যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ইতিহাসকে এখানে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। '৬০-এর দশকে লেখা এই নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদীদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও দুঃসাহসী কার্যকলাপ। অশোক এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র। শচী, বঙ্গবাসী, রাধাঁরানী, সবাই যেন বিপ্লবী। কেউ প্রত্যক্ষ কেউ পরোক্ষভাবে। এসব চরিত্রের মধ্যদিয়ে নাট্যকার আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের বিপ্লবী অবদানকে তুলে ধরেছেন।

তিতুমীর নাটকে কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরের সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। নাট্যকারের চোখে তিতুমীর একজন অতিকথার নায়ক। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'অতিকথা' মানুষকে এক বিশ্বাস প্রদান করে, যার ফলে সে নৈতিক বা ধর্মীয় কাঠামোর মাধ্যমে ঐ বিশ্বাসের দ্বারা বর্তমান জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চায়। তিতুমীরের চোখে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই ধর্মরক্ষা করার সংগ্রাম : 'যার যা আছে সবকিছু দিয়ে দিতে হবে, তবেই এই সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধার দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত হবে'।

হিটলারের নাৎসীবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়ার ইতিহাস উঠে এসেছে উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড' নাটকে। এই নাটকে আমরা ভীত, মতামত প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্থ ডাক্তার, হেরমান স্ট্রবেলদের পরিচয় পাই, ফ্রায়েৎসাইটুং পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক হাইনরিশ লাস্টদের পরিচয় পাই, যারা ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় ফ্যাসিবাদের সপক্ষে প্রচার করেন, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসার বান ডাকান, আবার অটোবিরখোলৎসের মতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দীর্ণ, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের পরিচয়ও পাই। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির নির্বাচনী জয়কে বার বার বাতিল করে এবং

শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে কিভাবে হিটলারের নাৎসী পার্টি ক্ষমতা দখল করল, তারও পরিচয় এই নাটকে রয়েছে।

'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' নাটকে কিউবার বর্ণময়, আলো-উচ্ছাস ভূমিকাই শুধু তুলে ধরা হয়নি, সমকালীন বিশ্বসংকটের পরিসরকেও ছুঁয়ে গেছে। বিপ্লবী ঐতিহ্য বিস্মৃত সোভিয়েত, পূর্ব ইউরোপ সমাজতন্ত্রকে ত্যাগ করেছে। ইতিহাসের এই সংকটে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কিউবা সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। তা এই নাটকে সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। যা দর্শকদেরকে সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের চেতনায় উদ্দীপিত করে।

সোভিয়েত রাশিয়া ও রুমানিয়ার পতনে প্রতিবিপ্লবকে উন্মোচন করে লেখেন 'প্রতিবিপ্লব' গ্রন্থ। লালদুর্গের পতনে সমাজ বদলের ডাক বিঘ্নিত হবে। এই আশংকার প্রেক্ষিতে তিনি লিখলেন 'লালদুর্গ' নাটক। ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহ্যকে নাট্যকার বিশ শতকের সমাজ বদলের লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টিতে স্মরণ করেছেন।

এছাড়া রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবী লেনিনকে নিয়ে 'লেনিনের ডাক', সোভিয়েত মুক্তির সংগ্রাম নিয়ে 'লেনিন কোথায়', রুশ বিপ্লবে লেনিন ও স্তালিন বিষয়ে 'স্তালিন ১৯৩৪', জার্মানির ফ্যাসিস্ট অত্যাচার, ইহুদি নিধন নিয়ে 'প্রফেসর ম্যামলক', আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে 'মানুষের অধিকার', মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামি সৈন্য ও জনগণের লড়াই নিয়ে 'অজেয় ভিয়েতনাম', ও বাংলাদেশের '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটকগুলো উৎপল দত্তের অন্যতম রাজনৈতিক নাটক।

নাটক উৎপলদত্তের কাছে নিছক অবসর-বিনোদনের আশ্রয় নয়, তা অস্ত্র; এবং এই নাট্যকারের কাছে তা 'টিনের তলোয়ার'ও নয় তা 'রাইফেল'। 'তীর', 'টোটা', 'কৃপাণ', 'রাইফেল', 'সন্নাসীর তরবারি', 'টিনের তলোয়ার'– নানা ধরনের অস্ত্রের নাম ও যুদ্ধবিদ্যার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তিনি নির্বাচনপন্থী সংশোধনবাদীদের অর্থনীতিবাদী, সংস্কারবাদী পথের বিপরীতে গণযুদ্ধের বিপ্লবী পথকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি বলেছেন– From The beginning of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perspective, Studing social phenomona in isolation, assuming each phase of developement as a whole, that is substituting the General with the particular, is a universal bourgeoies vice; (Twoards Revolutionary theatere, p28)

নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক উৎপল দত্ত আধুনিক এই কারণে যে তিনি বিশ্বের বিপ্লবী রাজনৈতিক থিয়েটারের স্মরণীয় প্রতিভাদের অনুসরণে বাংলা থিয়েটারে কি জীবনদর্শনে, কি নাট্যতত্ত্বে, মঞ্চায়নে, আঙ্গিক সৌকর্যে বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তিনি একদিকে বাংলা থিয়েটারের প্রতিটি ঐতিহ্য ভেঙেছেন, অন্যদিকে প্রতিটি ঐতিহ্যকে বিশ্বের বিপ্লবী রাজনৈতিক থিয়েটারি তত্ত্বের নিরিখে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি বিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ দশকের সবচেয়ে সফল, বৈচিত্রসন্ধানী নাট্যকার।

* *

থিয়েটারের রাজনীতি– রাজনীতির থিয়েটার কী করা উচিত ?

– উৎপল দত্ত

নোট : *'কী করা উচিত' উৎপল দত্ত লিখিত ইংরেজি বক্তৃতামালা `What is to be done ?' এর বাংলা অনুবাদ। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অমল কুমার রায়। দিল্লীর 'শ্রীরাম সেন্টার ফর আর্ট এন্ড কালচার' কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে এই বক্তৃতামালা তিনি পাঠ করেছিলেন। কলা ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা বিষয়ে উক্ত 'সেন্টার' প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে থাকে। 'কী করা উচিত?' সেই ধারার প্রথম বক্তৃতা।*

কলকাতার 'নোডাল রিসার্চ সেন্টার' ২৯ মার্চ ১৯৯৫ সালে বক্তৃতাটি একটি পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশ করে। পুস্তিকাটির ঈষৎ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পরে প্রকাশিত হয়। যার প্রথম অংশটি আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

– সহযোদ্ধা সম্পাদনা বোর্ড

এখানে প্রথম যখন আমি বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলাম তখন মনে হল, হয় আমি উন্মাদ, নয়তো উদ্যোক্তারাই উন্মাদ। এমন পরিবেশে কেউ কখনো আমাকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাননি। আমার বক্তৃতা দেবার পক্ষে এ সমাবেশ অতিমাত্রায় মার্জিত, অতিমাত্রায় ভদ্র। আমি সাধারণত ইংরেজিতে বলিও না লিখিও না। বলতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করব। দয়া করে ক্ষমা করবেন, মানিয়ে নেবেন। আমাদের নাটক শুরু হবার আগে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বলতে হয়। এসব নাটককে আমরা বলি পথ-নাটক আর মাইক থাকে না বলে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমরা চেঁচিয়ে সংলাপ বলি। রাস্তার মোড়ে পুলিশ মাইক ব্যবহার করতে দেয় না, কাজেই চেঁচাতে হয়, চেঁচিয়ে মারাত্মক সব বক্তব্য বলা হয়। সময় সময় কৌতুকের ব্যাপারও থাকে, তবে সে বড় গভীর কৌতুক এবং এমন গভীর যে শ্রোতাদের একটা অংশ হাসেনও না। স্বভাবতই তারা ক্ষুণ্ন হন। কাজেই আমার ভয় ছিল, বক্তৃতা দিতে গিয়ে না সব ভণ্ডুল করে দিই। বিশেষত এ বক্তৃতা যখন আবার ছাপাও হবে। এর অর্থ হল, বক্তৃতাটি

হবে লিখিত বক্তৃতা, আমি আবার লিখিত বক্তৃতা দেই নি। সে যাই হোক, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব মার্জিত বক্তব্য রাখতে।

এ পর্যায়ের নাম 'কি করা উচিত ?' 'কী করা উচিত' লেনিন রচিত এক বিখ্যাত গ্রন্থ। সর্বহারাদের আন্দোলনে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়েই এই গ্রন্থ। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া কথাটার ব্যাখ্যা দরকার। ইউরোপে তখন এই মহান আন্দোলন– 'ইউরোপের সর্বহারাদের আন্দোলন'– চলছিল। জনগণের এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বক্তব্য ছিল– শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিই সমাজতন্ত্রে যাত্রার একমাত্র পথ। অর্থাৎ শ্রমিকরা সংগ্রাম করবেন বোনাসের জন্য, তাঁদের মজুরির জন্য, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য নয়। এইসব ভ্রান্তি দূর করার জন্যই দরকার হল লেনিনের।

তিনি বললেন বর্ধিত বোনাসের দাবি যথার্থ, বর্ধিত মজুরির দাবিও যথার্থ, তবে এই দাবিই সব নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করে সর্বহারাদের বিশ্রাম নেই। 'কী করা উচিত?' এই গ্রন্থে লেনিন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার এই ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করলেন। বুর্জোয়া প্রচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলশেভিক পার্টির আদর্শগত বিভাগ ভুলও করেছিল। এবং ঐসব প্রচারের কিছু কিছু মর্মবস্তুর কোনো বিকল্প নেই, এমন একটা ভাবনাও ছিল। 'প্রাভদা' ও বলশেভিক পার্টির অন্যান্য পত্রিকা ঐসব প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল না। অর্থাৎ যেভাবে বুর্জোদের অভিযোগের জবাব দেবার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছিল না। কাজেই 'কী করা উচিত?' লেখা হল। সুতরাং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে লেনিন বুর্জোদের প্রভাব বলেই অভিহিত করলেন; বললেন, সর্বহারাদের ভিতরে বুর্জোয়া প্রভাব দৈনিক মজুরির সঙ্গে কটা টাকা বাড়তি যোগ তাদের পক্ষে অপরিহার্য, তাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক– সর্বহারা সবসময়ই এই সত্যে পৌঁছুতে পারে। তাকে এটা বলার জন্য, এটা বোঝাবার জন্য বলশেভিক পার্টির মতো পার্টির প্রয়োজন নেই। এটা সে জানেও। বলশেভিক পার্টি, বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র– এসবের কাছে লেনিনের দাবি ছিল, তাঁরা শ্রমিকদের কাছে গিয়ে ব্যাখ্যা করে বলুন এই সমাজ থেকে ইতিমধ্যে তাঁরা কি শিখেছেন, কি পেয়েছেন, এই সমাজের সুযোগগুলোই বা কি। যেহেতু তাঁরা শিক্ষিত তাই তাঁদের উচিত শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি নিয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার কথা নয়, বেতন বৃদ্ধি বা কয়েক রুবলের বোনাসও নয়। তাঁরা সর্বহারাদের কাছে, জনগণের কাছে রাজনীতি নিয়ে যাবেন– এটিই ছিল লেনিনের দাবি। কাজেই সর্বহারাদের আন্দোলনে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া হল এক বুর্জোয়া প্রভাব। একই ভাবে এবং এজন্যই আমি এই নামটা নিয়েছি। আমি আমাদের দেশের রাজনৈতিক থিয়েটারের কথা বলব, বলব এর লক্ষ্যের কথা; কিভাবে নানা উপায়ে শাসকশ্রেণি একে নষ্ট করতে চায় এবং এর লক্ষ্য থেকে একে বিচ্যুত করতে চায়– সে কথাও বলব। থিয়েটারকে যাঁরা 'বিশুদ্ধ' শিল্প বলে মনে করেন, যাঁরা থিয়েটারের জন্যই থিয়েটারকে ভালবাসেন, তাঁদের কথা মনে রেখে কোনো বক্তব্য বলার চেষ্টা আমার থাকবে না। ড্রাগের মাধ্যমে জীবনের একঘেয়েমি ভুলে থাকতে চায় বিত্তশালী দেশের এমন ধনীর দুলালদের কথাই এঁরা আমাকে মনে করিয়ে দেন। আমার মনে হয় না, ভারতের মতো দেশে যেখানে শতকরা চল্লিশ ভাগ মানুষ দুবেলা খেতে পায় না, সেখানে এরকম অপচয়ের কথা

আমরা চিন্তা করতে পারি। এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন তরুণ নাট্যকর্মী যাঁরা তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকেই একটা গুণ বলে চালাতে চেষ্টা করেন, তাঁদের দেখে জার আমলের সেন্ট পিটার্সবার্গের এক ডাচেস-এর কথা মনে পড়ে যায়। ঐ ডাচেস অপেরা খুব ভালবাসতেন এবং রাতের পর রাত অপেরার নায়িকার দু:খে অশ্রুবিসর্জন করতেন অথচ তাঁরই গাড়ির চাপরাশী শীতে জমে গিয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকত। আমার মনে হয় শিল্পের প্রতি এমন নারঘাতী প্রেম না থাকলেও চলবে।

রাজনৈতিক থিয়েটার মানুষের মনের বিকাশের জন্য সংগ্রাম। যে কোনো সমাজে শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণাই সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণাকেই আজ 'ভারতে শাশ্বত মূল্যবোধ' যা অন্য কোনো বিস্ময়কর নামে চালানো হচ্ছে। অচেতনভাবে আমরা ঐ সব কিছুকেই ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধ, ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি, ভারতের শাশ্বত শিল্প বলে গ্রহণ করছি। বস্তুত বুর্জোয়ারা আমাদের এরকম করতে আদেশ করছে বলেই আমরা এরকম করছি। এই শিল্প, শিল্পের এই আঙ্গিক, এই মূল্যবোধ, এই সংস্কৃতি– বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণিস্বার্থেই এসবের পোষকতা করে। তাদের টিকে থাকার জন্য অর্থাৎ শ্রেণি হিসাবে টিকে থাকার জন্যই এসব দরকার। তবে এমনভাবে ই তারা এসব উপস্থাপন করে যে, তাদের ধ্যান-ধারণাই যেন তাতে প্রাধান্য পায় এবং সামজের অন্য সমস্ত শ্রেণিও ক্রমে যেন সেসব যথার্থ মনে করে গ্রহণ করে। এসবের মধ্যে শ্বাশ্বত বলে কিছু নেই, ভারতীয়ত্বের নির্দিষ্ট কোনো ছাপ তো নেইই। আমরা যদি এসব বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব, যে শোষণ ও দস্যুবৃত্তি শাসকশ্রেণিকে টিকিয়ে রাখে তার সমর্থনে এবং শাসিতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খাপছাড়া ও অসংলগ্নভাবে ঐসব ধ্যান-ধারণা সংগ্রহ করছে। কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বোম্বাই শহরের বক্তৃতাগুলো ধরুন। সেগুলো শুনে মনে হবে, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থরাজি থেকে বস্তু চয়ন করে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা নামে সুনির্দিষ্টরূপে ভারতীয় একটি পাচন মাথা থেকে বের করেছিলেন। ভারত সরকার যাই করুক না কেন তাই আজ অহিংসা অভিধা পেয়ে যায়, এমনকি সে কাজ যদি পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ কিংবা অমৃতসরে সৈন্যবাহিনীর অভিযান হয় তাও। যে শত্রু সবসময়ই সে সহিংস আর প্রতিপক্ষ ভারতীয় হল এক ভারতীয় ক্ষমাশীল বুদ্ধ। আসলে অহিংসা ব্যাপারটায় ভারতীয় কোনো বিশিষ্টতাই নেই। আইরিশরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনশো বছর এর প্রয়োগ করেছিল আর গান্ধীজীও এ বিষয়ে লিও টলস্টয়ের চিন্তাভাবনা মুক্তমনেই গ্রহণ করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও অহিংসা যে বিশেষভাবে ভারতীয় একটা ব্যাপার তা বলে বেড়াতেই হবে। কেন এরকম করতে হবে ? না, ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণি ও জমিদারদের ভয়াবহ হিংসাকে ধুম্রাবরণে ঢাকতে হবে যে এবং জনগণ যাতে প্রতিরোধ করতে না পারেন, বিদ্রোহ না করেন ও অস্ত্র হাতে তুলে না নেন তার জন্য তাদের অস্ত্রহীন করতে হবে যে! মানুষের মনে দাসত্বের নিগড় পরাবার জন্য এ হল শাসকশ্রেণির এক আদর্শগত অস্ত্র। রাজনৈতিক

থিয়েটার ওদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা অস্ত্র – একটা আদর্শগত হাতিয়ার। শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণা যেখানে মানুষকে হীনবীর্য করে রাখতে চায়, ভেড়ার পালের মতো তাদের বধ্যভূমিতে ঠেলে দিতে চায়, রাজনৈতিক থিয়েটার সেখানে চায় তাদের চেতনা, তাদের বোধশক্তি, তাদের সংগ্রামমুখীনতাকে জাগ্রত করতে। শাসকশ্রেণি যেখানে ভারতের ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেখাতে চায় যে, ভারত বরাবরই ছিল অহিংস, রাজনৈতিক থিয়েটার সেখানে ভারতের ইতিহাসের সঠিক তথ্য নতুন করে আবিষ্কার করে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, অতীতের সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনের মূল ধাত্রী ছিল হিংসা এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। রাজনৈতিক থিয়েটার জনসাধারণের কাছে তাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে এবং অহিংসা যে আজ শাসকশ্রেণির ভয়ংকর মুখাবয়বকে লুকিয়ে রাখবার এক ভণ্ডামিপূর্ণ মুখোশ, এই সত্যকেও উন্মোচিত করতে সচেষ্ট।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি কর্তাব্যক্তিরা এখনও কাটাছেড়া করে চলেছেন যাতে সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান কৃষক বিদ্রোহগুলোকে একেবারে মুছে দেবার ব্যবস্থাই তাঁরা করেছেন। প্রসঙ্গত মহান সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের কথা বলা যায়। অথচ এই বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঝাঁসির রানী সম্পর্কিত দায়সারা উল্লেখ বাদে ১৮৫৭'র মহাকাব্যকে তারা প্রায় চেপে দিয়েছেন। তিনি এতটাই পরিচিতি লাভ করেছিলেন যে তাঁকে পুরোপুরি চেপে দেওয়া যায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মহীশূরে হায়দার আলী টিপু সুলতানের যুদ্ধগুলিতে যেখানে যেখানে ইংরেজ বাহিনী অপমানজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল সেসব প্রসঙ্গ তারা কখনও উল্লেখ করেন না।

ভারতের ইতিহাস থেকে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ এবং শিখদের দেশপ্রেমিক সংগ্রামকে এরা মুছে দিয়েছেন। মারাঠাদের সংগ্রামের উল্লেখ কখনই করা হয় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে এদের ভাষ্যে ১৯০৫ সালের বাংলার সশস্ত্র শহীদদের কোনো অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই ভগৎ সিং এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের, অস্তিত্ব নেই ১৯৪৬ এর 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি' র বিদ্রোহের, যেমন অস্তিত্ব নেই সুভাস চন্দ্র বসুর ও আজাদ হিন্দ ফৌজের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সম্পূর্ণ অংশটাকেই নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। বাস্তবে ভারতের দু'শো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটিমাত্র শব্দে পর্যবসিত করা হয়– শব্দটি গান্ধী– মহাত্মা, শ্রীমতী কিংবা রাজীব। ইতিহাসের এই ব্যাভিচারকে এর চেয়ে আর নির্লজ্জ দূরত্বে টেনে নেওয়া যায় না। ইতিহাস আসলে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সহস্র সহস্র মানুষ যাঁদের মধ্যে আবার বেশিরভাগ ছিলেন সশস্ত্র, যাঁরা, বহুবছর ধরে সংগ্রাম করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সম্মিলিত শক্তির চাপেইতো বৃটিশ ভারত ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত ত্যাগ এবং সংগ্রামকে একটি নামের জাদুতে পর্যবসিত করা কিংবা একজন মানুষ খাদি বুনতেন কিংবা ছাগলের দুধ

পান করতেন বলে ভারত স্বাধীন হয়েছে– এরকম দাবি করার হেতু অজ্ঞতা বা মুর্খতাই নয় (ওরা অত অজ্ঞ বা মূর্খও নয়); এর উদ্দেশ্য ভারতের জনসাধারণের সশস্ত্র সংগ্রামের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে তাকে মুছে দেওয়া এবং যাতে এই ঐতিহ্য তাদের অর্থাৎ জনসাধারণের বর্তমান আচরণে কোনো প্রভাব না ফেলতে পারে তার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করা।

প্রচারের এই ঝড়ের চূড়ায় রয়েছে এক ইংরেজ পরিচালিত 'গান্ধী' চলচ্চিত্রটি। ইংরেজদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি এতটাই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের তথাকথিত এক ঐতিহাসিক কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত অনেকটা সেলুলয়েড খরচ করে দেখিয়ে ফেললেন, যদিও ইতিহাসে এরকমটা কখনও ঘটেনি। দেখানো হলো, ক্রুদ্ধ ইংরেজ অফিসাররা জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই কসাইকে তার নিষ্ঠুরতার জন্য রূঢ়ভাবে জেরা করছে। সাম্রাজ্যবাদী ন্যায়নীতি সম্পর্কিত ধারণার বিষয়ে আধুনিক ভারতীয় দর্শকদের ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা। অথচ বাস্তবে ইতিহাসের ঘটনা ছিল এরকম। ইংরেজ বুর্জোয়ারা ডায়ারের জন্য ৮০,০০০ পাউন্ডের এক তহবিল তুলে দিয়েছিল এবং তার উদ্যোগ ও দৃঢ়তার জন্য ইংল্যান্ড জুড়ে সভা করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কোনো কোর্ট মার্শাল হয়নি। 'গান্ধী' চলচ্চিত্রে এরকম মিথ্যার ছড়াছড়ি। সে ছবিতে একজন নিষ্ঠুর ইংরেজ অফিসারও পাবেন না। সমস্ত মারামারি, পদাঘাত, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা – এসব কিছুই ভারতীয়দের দিয়ে করানো হয়েছে। ছবিতে ইংরেজদের দেখা যাবে ইংরেজদের শুভানুধ্যায়ীরূপে। এর দ্বারা পরিষ্কার করে ও নির্ভুলভাবে একটা কথাই বলা হল– গান্ধীজীর প্রতিভার স্বীকৃতি দানের জন্য ইংরেজদের প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছিল আর তারাই তাকে পৃথিবীতে পরিচিতি দিয়েছে। অবশ্য তাকে যে বহুবার জেলে পোরা হয়েছিল সে তো তাকে বিখ্যাত করার প্রয়োজনেই হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই কিম্ভূত ছবির আর্থিক বোঝাটা কিন্তু বহন করলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষই। স্বাভাবিক কারণেই, এমন গান্ধী পেলে যে তাঁদের সুবিধাই হয়। আর রেগানের আমেরিকার অন্য দাবিদারদের হাতিয়ে যতগুলো অস্কার দেওয়া যায় তা দিয়ে এই ছবিকে তুলে ধরা আবশ্যক বিবেচনা করল। এর দ্বারা তো এই ছবির প্রভুভক্তির নিদর্শনই প্রকাশ পায়, সাম্রাজ্যবাদের হাতে এর উপযোগিতা কতো সে কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তো সমস্ত দেশ জুড়েই এই ছবি দেখাতে চেয়েছিল। এ ছবির মুক্তি উপলক্ষে প্রথম শোতে সভাপতিত্ব করার জন্য (হয়তো সাদা চামড়াদের জন্য নির্দিষ্ট কোন হলে!) স্যার রিচার্ড এ্যাটেনবরো দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষ ও সেখানে বসবাসকারী এশীয়দের প্রবল প্রতিবাদ এবং এক সোয়াপো গেরিলা গ্রুপের বিচক্ষণ হুমকি শেষ পর্যন্ত স্যার রিচার্ডের উৎসাহে চিড় ধরাতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গান্ধীজী তার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই গান্ধীজী দর্শন কি করে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদীদের সাহায্য ও সান্ত্বনার

বিষয় হয়ে উঠতে পারে? কী করেই বা তা দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী মানুষগুলোর উপর আঘাত হিসেবে নেমে আসতে পারে? কী করে এই গান্ধী ছবিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বর সংখ্যালঘু শ্বেতকায় মানুষগুলো স্বাগত জানায় আর কি করেই বা গান্ধীজীর নিজেরই স্থাপিত 'আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস' দক্ষিণ আফ্রিকার যেখানেই এ ছবির প্রদর্শন হোক না কেন সেখানেই বোমা মারা হবে বলে ভয় দেখায়? এ কারণ সহজ। বুর্জোয়ারা এখানে সক্রিয়। গান্ধীকে তারা ট্রয়ের ঘোড়ায় পরিণত করতে পেরেছে। নিকারাগুয়া হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা হোক অর্থাৎ বিশ্বের বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোতে তারা এভাবে ঢুকতে চাইছে যাতে অন্তর্ঘাত করে সশস্ত্র প্রতিরোধের যে দর্শন তাকে শেষ করে দিতে পারে।

আমেরিকার অতগুলো অস্কার 'গান্ধী'র উপর কেন বর্ষিত হল এই তার একমাত্র কারণ। আর এমন একটা সময়ে দেওয়া হল যখন সে দেশে র‍্যাম্বের খুন-ধর্ষণ প্রশংসিত হচ্ছে। র‍্যাম্বো তাদের নিজস্ব আদর্শ। খুন কর, ধর্ষণ কর, বিবেকের কোনো দংশন ছাড়াই খুন-ধর্ষণ কর– আমেরিকার যুবকদের সামনে এই আদর্শই তারা তুলে ধরছে। সাম্প্রতিকতম একটি র‍্যাম্বো ছবিতে র‍্যাম্বো হল এক ভিয়েতনাম ফেরত সৈনিক। সে বলছে, 'আমরা এখানে হেরেছি, কারণ আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় ভিয়েতনামীদের হত্যা করতে পারিনি।' এইসব অস্কার পুরস্কার দিয়ে র‍্যাম্বোর পাশে অ্যাটেনবরোর শান্তির দূত গান্ধীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর-এর বিদ্রোহীদের এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষগুলোর সামনে তুলে ধরবার জন্য এই হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আদর্শ; গান্ধীকে অনুসরণ কর, অস্ত্র ত্যাগ কর যাতে আমরা জয়লাভের জন্য এবার পর্যাপ্ত সংখ্যায় হত্যা করতে পারি।

ধনবাদী জগতে বরাবরই নায়কের অভাব দেখা গেছে। চে গুয়েভারা কিংবা একজন নেলসন ম্যান্ডেলার ব্যক্তিত্বের জাদুর কথা নাইবা বললাম, ওদের তো ওরতেগা কিংবা শান্তশিষ্ট ডেসমণ্ড টুটুর সঙ্গে তুলনা করার মতো কেউ নেই। তাই অ্যাটেনবরো একজনকে খাড়া করতে চেয়েছেন, কীটদুষ্ট এক গান্ধী, যিনি উপনিবেশের মানুষদের কাছে একই ধরনের ধুসর বর্ণের বিজনেস-সুট পরিহিত রেগান বা শুল্‌টজদের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস পুনরাবিষ্কার করে এই দেশের রাজনৈতিক থিয়েটার ডজনে ডজনে ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে চাইবে, এ প্রত্যাশা আমাদের ছিল। ছোটনাগপুরের সাঁওতাল আদিবাসীদের বিদ্রোহই হোক, বীরসা ভগবানের শহীদের মৃত্যুবরণই হোক (নামই বলে দিচ্ছে, বিহারের মুণ্ডা অধ্যুষিত গ্রামে বীরসা এখন পূজিত হন, ভগবানের মতোই পূজা পান), এই দেশের মানুষ সর্বত্র সশস্ত্র শহীদদের পূজা করে, সন্ধায় তারা অজানা, যোদ্ধাদের সমাধিতে প্রদীপ জ্বালায়। রানী লক্ষী বাঈয়ের নামে, জগদীশপুরের বাবু কুনওয়ার সিং এর নামে, বিঠুরের নানা সাহেবের নামে, বাংলার ক্ষুদিরামের নামে এরাইতো সঙ্গীত রচনা

করেছিল। পৃথিবীজুড়ে অত্যাচারিত মানুষের এইতো রীতি। আমেরিকার জন ব্রাউনের নামে, জোয়ে হিলের নামে এবং কিভাবে বিশ্বাসঘাতক শেরিফ ডালটন-ভাইদের গুলি করে হত্যা করেছিল সে বিষয়ে এরাই তো গান লিখেছে। এরাই তো আয়ার্ল্যান্ডের গ্র্যানওয়ালাকে নিয়ে গান লিখেছিল, লিখেছিল ম্যাক সুইনিকে নিয়ে এবং কিভাবে লুসি রোজকে প্রত্যুষে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে। প্রত্যেকেই এসব গানের কথা জানেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি কিংবা মাউন্টব্যাটেন মিশন কিংবা গুজরাটের সংরক্ষণ নিয়ে আমাদের প্রিয় সাংসদদের গভীর রাতের আলোচনা– এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মানুষের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সঙ্গীত উৎসারিত হবে, এরকম চিন্তা একেবারেই অবাস্তব। যিনি সামাজিক উপেক্ষার শিকার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুবরণ করেছেন, যাঁকে বলির পশুর মতো মরতে হয়েছে কিংবা যিনি যিশুখৃষ্টের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ সংগ্রামরত অবস্থায় যাঁর মৃত্যু হয়েছে, মানুষতো সাধারণত তাঁদেরই উদ্দেশ্যে গান লেখে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহাসিক নাটকগুলো যে শুধু শাসকশ্রেণির ইতিহাসবিচ্যুতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ছিল তাই নয়, জনসাধারণের সঙ্গে দ্রুত সম্পৃক্ত হবারও একটা উপায় ছিল। আমাদের থিয়েটারে সাধারণ মানুষকেই যে আমরা চাই। দর্শক-শ্রোতার অভাবে আমরা অনেকেই রক্তাল্পতায় ভুগছি। শহরের দর্শকশূন্য প্রেক্ষাগারে অনেক রাজনৈতিক থিয়েটারে অন্তঃসারহীন কচকচিতে পরিণত হয়েছে। অনেকেই আমরা অভিযোগ করতে শুরু করেছি, এদেশে নাটক নেই। আমরা যদি সাম্প্রতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করতাম তাহলে সাধারণ মানুষের ভাললাগার মতো অনেক উপাদানই দেখতে পেতাম (এবং তাঁরা আমাদের থিয়েটারে কখন আসবেন সেজন্য বসে না থেকে আমরাই থিয়েটারকে তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম) আমরা অগুণতি নাটক ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ পেতে পারতাম।

সম্প্রতি আমাদের নাট্যকর্মীরা গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, তবে তা রাজনৈতিক লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু অন্বেষণ এবং নতুন নাটকের জন্য মালমশলা সংগ্রহ করার জন্য নয়, তাঁরা যাচ্ছেন এখান থেকে একটু গান, ওখান থেকে একটু নাচ যোগাড় করতে, যাতে এইসব শিল্পীদের টেনে শহরে নিয়ে আসা যায় এবং ঐ টুকরোগুলো পুরনো যে সব নাটক তাঁরা করছেন সে সবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। এই নাকি 'থিয়েটারের লোক-আঙ্গিকের ব্যবহার' বা এই রকমই একটা কিছু। ঐসব নাচ বা গান যে নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় প্রায়শই সেগুলো আদপেই মেশে না। সংযোজন বিসদৃশ হয়ে পুরো নাটককেই বেহাল করে ফেলে। কিন্তু তবু এসব করতেই হবে, কারণ এসব করাই যে হাল ফ্যাশান। আপনাকে আপনার থিয়েটারে লোক-উপাদান ব্যবহার করতেই হবে তাতে যদি আপনার নাটক মার খায় বা লোক-উপাদান নষ্ট হয় তো হোক।

এই শহুরেপনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। দুই-একদিন দেখে নিয়েই কোনো লোক-আঙ্গিক শিখে নেওয়া যায় না আর পুরোপুরি শিখেই যদি না নেওয়া যায় তবে তা

ব্যবহার করাও চলে না। থিয়েটারে লোক-প্রভাব আনতে হলে তার লক্ষ্য হবে একটাই: লোক-উপাদানকে এমনভাবে মিলিয়ে দিতে হবে যাতে থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়। লোক-উপাদানের টুকরো-টাকরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে দিলেই তার দ্বারা থিয়েটার সমৃদ্ধ হবে না বরং ধ্বংস হবে।

তবু এই প্রচার চলছে। যেহেতু সমস্ত প্রচার মাধ্যম ওদের হাতে, তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া এবং ভুস্বামীদের প্রচার-যন্ত্র প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে গাদা গাদা মিথ্যা ও ভয়ংকর সব ধারণার জন্ম দিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কারখানা যেমন যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে তেমনি ওদের সিনেমা– যা আজ পৃথিবীর কোণে কোণে প্রভাব বিস্তার করছে– প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার বেসাতি করে যাচ্ছে। এরা সাধারণ মানুষের উপর কি ধরনের বস্তু চাপিয়ে দিতে চাইছে যার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক থিয়েটারের মাধ্যমে আমাদের সংগ্রাম কারা উচিত?

ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার ফলশ্রুতিতে সিনেমায় নারীকে কুরুচিকরভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারটা হল আরেক অবিরাম চর্চার বিষয়। প্রবৃত্তিতাড়িত পুরুষদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে নগ্ন নারীর নৃত্য যদি বা নাও দেখানো হয়, তবু স্ত্রীর ধর্ম, স্ত্রীর বিশ্বস্ততার ন্যাক্কারজনক প্রদর্শন হিসেবে নারীকে দিয়ে নাকি কান্না কাঁদানো এবং স্বামীর পদযুগল চুম্বন করানো হয়। যে পা তাকে লাথি মারছে সেই পা-ই তাকে চাটতে– এই নাকি ভারতীয় ঐতিহ্য, প্রচীন ভারতীয় ধর্ম। কে জানে হয়তো শীগগিরই সতীদাহকে একটা পবিত্র ভারতীয় প্রথা হিসাবে গণ্য করা হবে। মানুষের মনকে সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার ইস্পাত-কাঠামোতে বেঁধে রাখা, শিক্ষার আলোক থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা, যে সমাজ ভিতর থেকে পচে গেছে তার প্রতি মিথ্যা অহমিকা পোষণ করা– এসবই এ জাতীয় ছবির বিষয়বস্তু বলে মনে হয়। এর ফলে বধূ নির্যাতকারীও তাদের কৃতকর্মের জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

এছাড়াও আছে নির্লজ্জভাবে কুসংস্কারের বেসাতি করার জন্য এবং যুক্তিবাদী চিন্তার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি ছবির নিয়ত প্রবাহ। আমি 'সন্তোষী মা'র মতো ছবির কথা বলছি। বাতিল কোনো স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসকে আস্তাকুঁড় থেকে তুলে নিয়ে অবিরত এরা নতুন 'মা' আবিষ্কার করে নতুনভাবে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে চলেছে।

অবশ্য এই ঝোঁকের পাশাপাশি নতুন গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনাও রয়েছে, রয়েছে সাহসী চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষামূলক ছবি। তবে পরাক্রমশালী পুঁজিপতিদের ক্ষমতা, তাদের প্রচার-যন্ত্র, পরিবেশকদের একচেটিয়া বন্দোবস্ত, ছবির মুক্তিতে বাধা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হাজারো দস্যুসুলভ উপায় এঁদের একেবারে তলিয়ে দেয়।

শাসকশ্রেণির অপর ক্ষমতাশালী অস্ত্র টিভির (দুঃখিত, আকাশবাণী– না, না দূরদর্শন) কথাই ধরুন না কেন। এর পুরোটাই নগত টাকার বিনিময়ে বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই চিত্তবৃত্তহীন লোকগুলো– এরাই আবার ভারতীয় বুর্জোয়া-টিভির অনুষ্ঠানসূচিকে এদের স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। একটা নাটককে

ওরা আদৌ নাটক বলে মনে করে না, ওদের কাছে তা শ্যাম্পু বা সাবানের বিজ্ঞাপনের বাহন, যে বিজ্ঞাপনে নগ্ন নারীকে ঝর্ণায় স্নানরত অবস্থায় কিংবা আলুলায়িত কেশদাম এপাশ থেকে ওপাশে দুলিয়ে ছুটে বেড়াতে দেখা যায়। আমাদের এমন কোন অনুষ্ঠানসূচি নেই যার জন্য শাইলকের মতো কেউ না কেউ টাকা না দেয়। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী টিভি-বক্তৃতা এক বিশেষ জুতার কালি প্রস্তুতকারক স্পন্সর করবে, এমন প্রত্যাশাও আমরা করতে পারি। এটাই স্বাভাবিক, একান্তই স্বাভাবিক আর এ ব্যাপারে মাথা গরম করেও লাভ নেই যে, শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়ারা গণসংযোগের প্রতিটি মাধ্যমেই প্রভুত্ব করবে।

টিভি ও রেডিওর জন্য তারা যে ভাষা আবিষ্কার করেছে তার কথাই ধরুন। ভারতে মুঘলরা পার্শী কথা বলে আনন্দ পেত, তারা জানত যে সাধারণ মানুষ সে ভাষা বোঝে না। ইংরেজরা সেজন্যই ইংরেজিতে কথা বলত। বর্তমান শাসকরা একটা ছুরি নিয়ে হিন্দির পেছনে লেগে পড়েছে; প্রতিটি উর্দু, পার্শী অথবা আরবী শব্দ তারা কেটে বাদ দিচ্ছে, যদিও সেসব শব্দ সমস্ত ভারতে বোধ্য। তারা ঐসব শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত অভিধান দেখে নতুন শব্দ বানাচ্ছে। এর ফল এই হয়েছে যে টিভির সংবাদ এখন বারণসীর পণ্ডিত ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

কাজেই এরা যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে ভাষার কথা অস্পষ্টভাবে বলতে চাইছে– ভারতের ক্ষেত্রে তার যে রূপই হোক না কেন– সে ভাষা যে শুধু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথ রুদ্ধ করছে তাই নয়, তা হিন্দি ভাষাকেও ধ্বংস করছে। হিন্দি এক শুষ্ক ব্যকরণের কচকচিতে পরিণত হচ্ছে, দেশে এ ভাষাতে কেউ কথা বলে না। যখন একটা ভাষায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কথা বলে এবং অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করে তখনই সে ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। সচেতন বা অচেতন দুভাবেই ধার করা চলে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা তো দূরের কথা, ভাষার এই মূর্খামিপূর্ণ জারজত্ব দেশকে দ্রুত অনৈক্যের পথে নিয়ে যাচ্ছে। শাসকশ্রেণি যদি প্রকৃতই একটা সর্বভারতীয় ভাষা প্রচলন করতে চাইত তাহলে তারা দেখতে পেত যে, এরকম একটা ভাষা প্রচলিত রয়েছেই। সজীব, প্রাণবন্ত এক হিন্দী ভাষা, একশো বছর ধরে ভারতীয় রেলকর্মচারীরা এভাষা ব্যবহার করে আসছেন। এভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী না হতে পারে, তবে সুখশ্রাব্য এবং সহজে শেখা যায়। স্বেচ্ছাগৃহীত অজস্র ইংরেজি, তামিল ও তেলেগু শব্দ এতে রয়েছে। বাংলা ও আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের আঞ্চলিক ভাষা সাদ্রির কথাই ধরা যাক না। এটাও প্রধানত হিন্দী তবে এতে আছে অসংখ্য সাঁওতালী ও ওরাঁও ভাষার শব্দ। চা-বাগানগুলিতে সমস্ত ভারতের অজস্র শ্রমিক কর্মরত। তাঁরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করতে কখনও কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। সর্বসাধারণের ব্যবহারের একটা ভাষা সকলের মিলিত শ্রমেই তৈরি হয়। অভিন্ন অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার চাপেই তা সৃষ্ট হয়; অন্ধ গোঁড়ামি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু জনসাধারণের ঐক্যের বিষয়ে ভারতের শাসকশ্রেণির কোনো আগ্রহই নেই। দেশের একটা ভৌগোলিক ঐক্য রক্ষা

করতে পারলেই তারা খুশি, তাতে দেশকে আরো ভালোভাবে শোষণ করা যায়; কাঁচামাল এখান-ওখান থেকে কারখানায় নিয়ে যাওয়া যায়। এবং উৎপাদিত দ্রব্যের একটা স্থির বাজারও পাওয়া যায়। মানবিক কারণ, সাংস্কৃতিক কারণ এবং নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারের প্রশ্ন– এসব কিছুই শাসকশ্রেণির কাছে একান্ত বিরক্তিকর। এজাতীয় আকাঙ্ক্ষা তাদের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমগোত্রীয়। তাৎক্ষণিক মুনাফার অঙ্গীকার বহন করে না এরকম সবকিছুই তাদের দৃষ্টিতে মারাত্মক ও দেশদ্রোহীতামূলক। শোষিতের ঐক্যকে এরা ভয় পায়।

এরাই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের আত্মপ্রকাশের অধিকারকে দাবিয়ে রেখে দেশকে এক ভয়ংকর বিপদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরা হরিয়ানা কে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে কিংবা আসামের তেইশ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে ইতস্তত করে না। এরা অঙ্গ রাজ্যগুলির সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করে এবং মানুষ যখনই তাদের নিজেদের সম্পদের একটা ন্যায্য অংশ দাবি করে তখনই তারা সৈন্যবাহিনীকে গুলি বর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজ করার নির্দেশ দেয়। এরা চায় সমস্ত দেশে নতুন দিল্লি একটা ভীতিপ্রদ নাম হিসেবে পরিচিত থাকুক।

এটা ঠিক যে, বুর্জোয়া ও ভূস্বামীরা দেশের ঐক্য রক্ষা করবে না। ওরা নিজেরাই এই ঐক্যের পক্ষে সব থেকে বড় বিপদ। এরাই প্রথমে আকালীদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য ভিন্দ্রানওয়ালেকে সৃষ্টি করেছিল এবং এরাই আসামের জঘন্যতম উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল।

আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা, ইতিপূর্বে একবার দেশ ভাগ করেছিল, এবং বিনা দ্বিধায় কোনো প্রকারে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান-শিখ রক্তে এই দেশকে নিমজ্জিত করেছিল। এইসব চরম বিশ্বাসঘাতকদের মুখে দেশের সংহতির কথা, খুব কম করে বললেও বলতে হয়, হাস্যকর।

এই সবের সঙ্গে যে নির্জলা মিথ্যা সংবাদপত্রের বিশাল ব্যবস্থাপনায় ছেপে বের করা হচ্ছে তাকেও যোগ করতে হবে। সেইসঙ্গে যোগ করতে হবে কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর চরম নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত মন্তব্যকে কোনো মহান রাজনীতিবিদের মুখ নিঃসৃত বাণী হিসাবে সম্মান দেখানো হচ্ছে। কিভাবে তারই করা কুখ্যাত চুক্তিগুলো সম্পর্কে চরম অসত্য ছড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ওগুলোর মাধ্যমেই এদেশের শান্তির অভ্যুদয় ঘটবে। এবং কিভাবে দেশকে খন্ড খন্ড করার শাসকবৃন্দের যে অপচেষ্টা তার দায় বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকেই ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম বলে চালানো হচ্ছে।

রাজনৈতিক নাট্যকর্মীদের 'কী করা উচিত' এই প্রশ্ন নিয়ে কোনো আলোচনা করার আগে বুর্জোদের এই যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আক্রমণ তার একটা মূল্যায়ন আবশ্যক।

সত্য সম্পর্কিত ধারণা

আমাদের নাটকে চরম ও নিরপেক্ষ সত্যের দাবি করা সমালোচক ও কিছু নাট্যকারের ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁরা যাই বলুন না কেন, আমরা যখন কোনো নাটক লিখি তখন তো আমাদের পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। তারা আমাদের উপর ইতিহাসের ঘটনা বিকৃতির দায় চাপিয়ে দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একবার তারা ১৯৪৬ সালের বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহ নিয়ে আমাদের নাটক 'কল্লোল' সম্পর্কে এরকম অভিযোগ করেছিলেন। তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বৃটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স' দ্বারা বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও বিদ্রোহী যুদ্ধজাহাজ 'খাইবার' আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছে বলে আমরা দেখালাম কেন? ইতিহাস বলছে, দ্বিতীয় বিমান আক্রমণের পরই 'খাইবার' আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা চেঁচিয়ে বললেন: অনৈতিহাসিক! সত্যের অপলাপ!

কিন্তু আপনারতো দেখছেন, চরম সত্যে আমাদের একেবারেই কোনো আস্থা নেই। সত্য সর্বদাই শ্রেণি-সত্য। প্রত্যেকটা ব্যাপারেই অন্তত দু'ধরনের সত্য জড়িত থাকে– বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য ও সর্বহারাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য। বুর্জোদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে 'খাইবার' যথার্থই আত্মসমর্পণ করেছিল। ('খাইবার' ছিল একটা যুদ্ধজাহাজের নাম। ১৯৪৬-এর বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহে 'খাইবার' দুঃসাহসিক যুদ্ধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ যখন এই যুদ্ধজাহাজের বোমাবর্ষণ শুরু করল তখন 'খাইবার' আত্মসমর্পণ করল।) কিন্তু আমরা আমাদের নাটকে দেখালাম 'খাইবার' আত্মসমর্পণ করেনি। বিমান-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যেতে 'খাইবার' চিৎকার করে বলতে থাকল: 'আমরা আত্মসমর্পণ করবো না' (এটাই বিতর্কের বিষয়)। বুর্জোয়াদের কাছে 'খাইবার'-এর আত্মসমর্পণের অর্থ হল বিদ্রোহের শেষ এবং সেটাই আসল কথা। আর সর্বহারাদের কাছে খাইবারের আত্মসমর্পণের অর্থ হল, যে স্বাধীনতা সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি তারই একটা দীর্ঘ পর্যায়ের শুরু। সুতরাং কোনো সংবাদপত্র যদি বা বলতে পারে 'খাইবার আত্মসমর্পণ করেছে', একটা রাজনৈতিক নাটক তা পারে না। 'খাইবার' যে আত্মসমর্পণ করেছিল এটা কেবলমাত্র একটা ঘটনা, এটাই সত্য নয়। 'খাইবার' যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল সত্য তাকে নিয়েই। বুর্জোয়াদের জেদ– যা দেখবে তাই লিখতে হবে, ঠিক যেমনটি আছে। ম্যাক্সিম গোর্কি ও বের্টোল্ট ব্রেখট এই উভয়েরই কথা: যা আছে শুধু তাই সত্য নয়, যা হবে, যা হওয়া উচিত তাও সত্য। একই কারণে আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত বিদ্রোহী জাহাজ 'পটেমকিন' ও কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি, যদিও ইতিহাস বলে, 'পটেমকিন' আত্মসমর্পণ করেছিল।

এটা কি ইতিহাসের বিকৃতি? নিশ্চয়ই নয়। বরং বলা যায়, এই চিত্রায়নই ইতিহাসের মর্যাদারক্ষক, কারণ যুদ্ধজাহাজ 'পটেমকিন'-এর বিরোধিতার মধ্যেই ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের ছায়াপাত ঘটেছে। ছবিটা যদি 'পটেমকিন'-এর শোচনীয়

আত্মসমর্পণেই শেষ হয়ে যেত তাহলে দর্শকদের দৃষ্টি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দিকে আকৃষ্ট হত না। তারা একটা তাৎপর্যহীন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন মাত্র। ঘটনার পশ্চাতে যে সত্য বর্তমান আইজেনস্টাইন তা ছুঁতে পেরেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন পক্ষভুক্ত, নিরপেক্ষ নন। তাই স্ববিরোধী হলেও বলতে হয়, পক্ষভুক্ত হলেই যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায়। একজন নিরপেক্ষ, বিযুক্ত, আবেগবর্জিত অনুসন্ধানী শেষ পর্যন্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হয়তো প্রায়শ অসত্যভাষী হয়ে পড়েন। কিংবা আরও মারাত্মক, তিনি হয়তো বুর্জোয়া জীবনদর্শনের প্রবক্তাও হয়ে পড়তে পারেন। পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক থিয়েটারের এই সুবিধাটা রয়েছে, তারা মার্কস ও এঙ্গেলস-এর দর্শন থেকে তাদের উপজীব্য গ্রহণ করে, বুর্জোয়ারা তা পারে না। এই দর্শনে কোনো একটা ঘটনাকে অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিচার করা হয় না, একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই তাকে বিচার করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সর্বহারাদের দর্শনই হল রাজনৈতিক থিয়েটারের পথ প্রদর্শক।

সর্বহারা অভ্রান্তভাবে সত্যে পৌঁছায় আর বুর্জোয়া, ভাড়াকরা লেখক এবং ভাড়াটে দার্শনিকদের সমস্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও, উত্তর না জানা প্রশ্নের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে, বাস্তবকে অলীকের আবরণে মুড়ে দেয়, ম্যাকলুন থেকে আধা-মার্কসবাদী ফ্রাঙ্কফুর্ট তক অজস্র দার্শনিক গোষ্ঠীর জন্ম দেয় এবং কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বর ও ধর্মের কাছেই ফিরে ফিরে আসে– কেন এরকম হয়? আমেরিকার মার্কসবাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক জেমসন সুন্দরভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : এর কারণ হল বুর্জোয়াদের জল্পনা-কল্পনা করার যথেষ্ট সময় রয়েছে; কিন্তু তাদের জগৎ সংকট, ক্ষতি আর মন্দায় পূর্ণ। এই কারণেই তারা স্ব-বিরোধী চিন্তার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকাশ করে। শ্রমিক বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত, তাই তার চিন্তার অবকাশ নেই আর তার ফলে সে বিমূর্ত চিন্তার বিপদ থেকে মুক্ত। সর্বহারার পক্ষের বিপর্যয়কর বলে মনে হলেও (কারণ বসে চিন্তা করার মতো সময় তার নেই) তার সুবিধার দিকটা হল যে, বিমূর্ত চিন্তা করার মতো কোনো সময়ই তার নেই। শ্রমিক নিজেকে তার উৎপাদনের অংশ বলে মনে করে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সে একটি মুহূর্ত আর এটাই তার দর্শনের দৃঢ় বস্তুবাদী ভিত্তি। আমেরিকার মার্কসবাদী ফ্রেডারিক জেমসন এভাবেই বিষয়টার ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রমিক নিজেই উৎপাদনের অংশ; উৎপাদনে সে নিজেকে একটা মুহূর্ত বলে অনুভব করে। কাজেই সে যে বেঁচে আছে এই ঘটনাই তার কাছে পুঁজিবাদী সমাজের সত্যকে উৎঘাটিত করে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কিত সত্য সে আবিষ্কার করে। রাজনৈতিক থিয়েটার শাসকশ্রেণির বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি, মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা প্রভৃতির সঙ্গে ইতিহাসের প্রক্রিয়ার যোগসূত্র খুঁজে বের করতে চায়। তাদের নিজেদের বিলুপ্তির প্রতি শাসকশ্রেণীর যে ভীতি, জনসাধারণের প্রতি তাদের যে ভয় এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি– এসব কিছুর সঙ্গেই রাজনৈতিক থিয়েটার ইতিহাসের প্রক্রিয়ার যোগসূত্র অনুসন্ধান করে বের করতে চায়। আমাদের নাটকের

বিষয়বস্তু যদি হয় একটিমাত্র ঘটনা তবে তাকেও আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই বিচার করি। আর তা করতে গিয়ে শাসকশ্রেণীর চরম গোপনীয় বিষয়, তাদের অস্ফুট নিষেধ এবং তাদের সব থেকে স্পর্শকাতর স্থান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ভয় পেলে চলবে না। ইউরোপের রল্‌ফ হোছুৎ তাঁর 'দ্য ডেপুটি (Der Stellvertreter) নাটকে ইহুদী-নিধনে পোপের যোগসাজস দেখাতে গিয়ে তাই করেছিলেন। এ এক বিশাল নাটক, সবটা অভিনীত হতে ন'ঘন্টা সময় লাগে। ইউরোপে ইহুদী–হত্যায় পোপের সঙ্গে হিটলারের যোগসাজসের প্রামাণিক তথ্য এতে দেওয়া হয়েছিল। এই নাটক অভিনীত হলে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ উদ্বেলিত হয়ে উঠত, কারণ এতে তিনি বুর্জোয়াদের সব থেকে স্পর্শকাতর, তাদের দৃষ্টিতে সব থেকে অনুচিত বিষয়ে– অর্থাৎ ধর্মে হাত দিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চকে আঘাত করেছিলেন এবং বলতে পেরেছিলেন, এই চার্চ হল হিটলারের দোসর। আমাদের দেশে আমাদের রাজনৈতিক থিয়েটার ভয়ে ভীত, অবশ্য অতীতে তাদের অনেক কিছুর মোকাবিলা করতে হয়েছে, তারা জেলে গেছে, তাদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের দেশের কোনো একটা সময়ের সব থেকে বিতর্কিত বিষয়কেও নাট্যকাররা ছেড়ে যান। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে সমস্ত প্রশ্নে জনসাধারণের মন সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়িত হয় প্রথমে তো সে সমস্ত প্রশ্নই বিবেচনা করা উচিত। আমাদের পাঞ্জাবী নাট্যকাররা 'অপারেশন ব্লুষ্টার' নিয়ে নাটক লিখে বিধ্বংসী সব প্রশ্ন তুলে ধরবেন– এ প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। একটা মন্দিরকে দুর্গে পরিণত করার আগে কেন ভিন্দ্রানওয়ালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না? রাজীব গান্ধী কি ভিন্দ্রানওয়ালের একজন সব থেকে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন না? গুরু অর্জুন জয়ন্তীর দিনে তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ স্বর্ণমন্দিরে আক্রমণ করা হল কেন? আত্মসমর্পণ করার পর মন্দির প্রঙ্গণে কতজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল? গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওদের ব্যতিব্যস্ত করে দিতে হবে। ছুরি চালিয়ে দিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন একজন রাজনৈতিক নাট্যকারকে তো এভাবেই চিন্তা করতে হবে।

কী করা উচিত? – এ হল তার একটা দৃষ্টান্ত। শাসকরা যে সব প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যেতে চায় সেগুলো নিয়েই গণবিতর্ক সৃষ্টি করুন। এইসব প্রশ্নে জনসাধারণকে যুক্ত করাই তো আমাদের কর্তব্য, কারণ তারাই তো প্রধান সংশ্লিষ্ট পক্ষ। এসবের সঙ্গেই তাদের দেশের নিরাপত্তা জড়িত। স্কুলের কোনো মাতব্বর কিংবা সৈন্যবাহিনীর কোনো পাতি সুবেদারের কোনো অধিকার নেই তাদের কাছ থেকে এই সব প্রশ্ন সরিয়ে রাখার।

* *

দণ্ডকারণ্যের চেতনা নাট্য মঞ্চের প্রধান কমরেড লেঙ-এর সাক্ষাৎকার

দণ্ডকারণ্য অন্ধ্র-বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত ছত্রিশগড় রাজ্যের বস্তার এলাকাভিত্তিক ভারতের মাওবাদীদের একটি গেরিলা অঞ্চল। "চেতনা নাট্যমঞ্চ" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। গ্রামভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় এই গণসংগঠনটি গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে। গ্রামের আদিবাসী-অনাদিবাসী হাজার হাজার লেখক, শিল্পী চেতনা নাট্য মঞ্চে সংগঠিত হয়েছেন। যা নয়াগণসংস্কৃতি গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে ভারতের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণির হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেরিলা অঞ্চলের বাইরে সমগ্র ভারত এবং বিশ্বের সকল বিপ্লবী ও মুক্তিকামী জনগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় বিপ্লবের কণ্ঠস্বর 'পিপলস মার্চ' এর মুখোমুখি হন চেনাম প্রধান ক. লেঙ। ২০০৬ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সাক্ষাতকারটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের পাঠকদের সুবিধার্থে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা অনুবাদকে আমাদের বাংলায় সম্পাদনা করা হয়েছে।
– সহযোদ্ধা সম্পাদনা বোর্ড

পিপলস মার্চ : কমরেড, দণ্ডকারণ্যের চেতনা নাট্য মঞ্চ গড়ে ওঠার পটভূমি সম্পর্কে বলুন।

কমরেড লেঙ : এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে, যখন বিপ্লবী আন্দোলন দণ্ডকারণ্যে পা রাখল। ২৫ বছর আগে (১৯৮০ সালে) বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও প্রবেশ করল। আপনারা জানেন, দণ্ডকারণ্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। শিল্প-সংস্কৃতি এখানকার জনজীবনের অবিভাজ্য অঙ্গ। তাই বিপ্লবীরা জনগণকে জাগাতে প্রথম থেকেই গান, নাচসহ বহু শিল্প রূপের ব্যবহার করেছেন। বাস্তবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ছাড়া কোনো সমাবেশ হয় না। প্রথম প্রথম শুধু গেরিলারাই গোন্ডি ভাষায় অনুদিত জননাট্য মণ্ডলীর নাচ-গানের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতেন। পরবর্তীকালে পরম্পরাগত আদিবাসী গানের সুরে গেরিলারা গান বাঁধতে শুরু করেন। বিপ্লবী আন্দোলন ততদিনে গণআন্দোলন হয়ে গেছে। শত শত লোক বিভিন্ন দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন।

তাঁদের মধ্যে বহু লোক গান লেখা শুরু করেন এবং তাঁদের নতুন বিপ্লবী উদ্দীপনা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত হয়। এর মধ্য দিয়ে তারা বিষয়বস্তু এবং রূপের রূপান্তর করেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের দ্রুত বিকাশের ফলে জনগণের মধ্য থেকে শত শত নতুন লেখক এবং শিল্পীরা উঠে এসেছেন। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দলগুলো গেরিলা বা বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হতো– যাঁরা গ্রামে বা যেখানে প্রয়োজন হতো সেখানে অনুষ্ঠান করতেন। একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনে সংগঠিতভাবে জোর দিয়ে শত শত শিল্পীর কর্মশক্তিকে যাতে প্রবাহিত করা যায় সেই লক্ষ্যে পার্টি 'চেতনা নাট্য মঞ্চ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

পি এম : চেতনা নাট্য মঞ্চ যখন গঠিত হয় তখন তাদের কর্মসূচি কি ছিল?

লেঙ : সংগঠন তার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে তার লক্ষ্য এবং কর্মসূচি প্রচার করে। সাংস্কৃতিক মোর্চাও বিভিন্ন শিল্পরূপের মাধ্যমে সেই কাজ করে। অতএব তার প্রথম কাজ হলো– আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় কাজ হলো– জনগণের শিল্পের অধ্যয়ন করা এবং তৃতীয় কাজ হলো– জনগণের শিল্পরূপের বিপ্লবীকরণ। চেতনা নাট্য মঞ্চ যখন গঠিত হয়, তখন পুরো দণ্ডকারণ্যে একটি সাংস্কৃতিক দল ছিল। তাই আমরা এই ধরনের আরও দল গড়ার উদ্যোগ নিই এবং বহু নতুন শিল্পীকে প্রশিক্ষিত করি। সেটি ছিল চতুর্থ কাজ।

পি এম : এই কাজগুলো কি করে সম্পন্ন করলেন তা কি আপনি ব্যাখ্যা করবেন?

লেঙ : গত দশ বছর ধরে আন্দোলন বিকশিত করার চেষ্টা চলছিল– চিন্তাধারা বদলানো, বোধ বদলানো, অনুশীলনের ফলে সমঝদারি বিকশিত হওয়া। চেতনা নাট্য মঞ্চকে দণ্ডকারণ্যের একটি গণসংগঠন হিসেবে বিকশিত করতে কয়েক বছর লেগে গেছে। গত তিন বছরে ঘাসমূল স্তরে সুসংগঠিত গণসংগঠন হিসেবে তা গড়ে উঠেছে। গ্রামের আদিবাসী-অনাদিবাসী, লেখক-শিল্পীদের তা ঐক্যবদ্ধ করেছে। বর্তমানে হাজার হাজার লেখক, শিল্পী চেতনা নাট্য মঞ্চকে শক্তিশালী করেছে। এটাই মহান উপলব্ধি। এটা অত্যন্ত ভালো অগ্রগতি। বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে চেতনা নাট্য মঞ্চ বা চেনামকে গ্রামস্তরে বিকশিত করা হয়েছে। একটি ঘোষণপত্র ও সংবিধান রচনা করা হয়েছে। একটি পতাকা ঠিক করা হয়েছে। ১৯৯৪ থেকে সংগঠনের সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'ঝংকার' প্রকাশিত হচ্ছে। এটি আরও একটি উপলব্ধি; যা এখন সংগঠনের মুখপত্র হয়ে গেছে।

আমরা গণসংস্কৃতি বিকশিত করছি এবং তাদের শিল্পের শিল্পরূপগুলোর বিপ্লবীকরণ করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী–লেনিনবাদী)(জনযুদ্ধ)'র নবম কংগ্রেসে আধার (নির্ভরশীল) এলাকা নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সাংস্কৃতিক মোর্চা সেই অনুসারে তার কাজ ঠিক করেছিল। এই কাজ পুরো করার জন্য তাদের করণীয় কাজ ছিল– গণশক্তিকে শক্তিশালী করে সেই ভোরের প্রস্তুতির জন্য সবকিছু করতে তৈরি থাকা। তাই চারটি কাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যারা এই ধারায় আসতে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে আসাই চেনামের নির্ধারিত কর্মসূচি। আমরা মনে করি, সেখানে ভালো অগ্রগতি হয়েছে।

পি এম : চেনাম দলের প্রচেষ্টা কি ধরনের ছিল?

লেঙ : ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ বস্তারে চেনামের একটি মাত্র সাংস্কৃতিক দল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে দণ্ডকারণ্যজুড়ে আরও কয়েকটি দল গঠিত হয়। ফল ছিল আশাপ্রদ। তাই ২০০৩ সাল নাগাদ মোটামুটি জেলা স্তরে দল গঠন করা হয়। কয়েকটি জায়গায় বিভাগের অন্তর্গত এলাকার দলগুলো গঠিত হয়। প্রথমে আমাদের দল গঠনের ভিত্তি ছিল– যাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন এবং যাঁদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা রয়েছে সেই নবযুবারা। এখন ৪-৫টি গ্রামের যুবক-যুবতীদের নিয়ে আমরা বড় স্তরে ইউনিট গঠন করি। সেই শিল্পীদের প্রতি আরও একটি দৃষ্টিকোণ হলো– পুরুষ এবং নারী উভয়ের চেতনার স্তর উন্নত করা– চেনামের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে তাঁরা কাজে আত্মোৎসর্গ করতে তৈরি থাকবেন। সংগঠনের ঘোষণাপত্র এবং সংবিধান অনুসারে বিভাগ বা এলাকা স্তরে তাঁরা কাজ করছেন। সংগঠনের বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জেলার দলগুলো এখন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে এবং এলাকার সাংস্কৃতিক দলগুলোকে বিকশিত করছে। এভাবেই এলাকার দলগুলো অন্য সাংস্কৃতিক দলগুলো বিকশিত করতে মনোযোগ দিচ্ছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিকশিত করার জন্য চেনাম সাংস্কৃতিক দলগুলোকে প্রশিক্ষিত করে যাচ্ছে।

পি এম : চেনামকে গণসংগঠন হিসাবে কিভাবে গঠন করলেন, তার কাঠামো সম্পর্কে বলুন?

লেঙ : এখনো পর্যন্ত আমরা পাঁচ থেকে ছয় হাজার সাংস্কৃতিক কর্মীকে যুক্ত করতে পেরেছি। দণ্ডকারণ্যে ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রামে ২০ থেকে ৩০টি কুঁড়েঘর। পুরুষরা 'দণ্ডকারণ্য আদিবাসী কৃষক মজদুর সংঘম' (ডি

কেএমএস) এবং নারীরা 'ক্রান্তিকারী মহিলা সংগঠনের' (কেএমএস) সদস্য হন; কিন্তু তাঁরা অন্য কোনো সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না এমন নয়। তাই তাঁদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহীরা চেতনা নাট্য মঞ্চের সদস্য হতে পারেন। একমাত্র সিদ্ধান্ত হলো– এক সময়ে একই সঙ্গে দুটি সংগঠনের নেতৃত্বকারী অবস্থানে তাঁরা থাকতে পারবেন না। দায়িত্ব নির্বাহের ব্যাপারে বাস্তবিক সমস্যা থেকে শিক্ষা নিয়ে সংবিধানে এটি লেখা হয়েছে। সেজন্য আমরা সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠনের সময় প্রতিটি গ্রামে গঠন না করে চার বা পাঁচটি গ্রাম মিলিয়ে একটি ইউনিট গঠন করার কথা ভেবেছি। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে যে নতুন শক্তি উঠে আসছে তার কথাও আমাদের ভাবতে হয়েছে। ৪-৫টি গ্রামের জনগণ তাঁদের জনতন সরকার নির্বাচিত করবেন। তাই চেনাম নিয়ে যাঁরা আগ্রহী সেইসব ৪-৫টি গ্রামের শিল্পীদের নিয়ে তাদের ইউনিট গঠন করা হয়েছে। বড় গ্রামে আমরা একটি গ্রামের জন্য একটি ইউনিট গঠন করেছি। তাঁদের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। জেলা এবং এলাকার কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। ভবিষ্যতে দণ্ডকারণ্য (জোন) স্তরেও কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। এইভাবে গ্রামভিত্তিক কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে জোন স্তরের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে কাঠামোকে আমরা সুদৃঢ় এবং গনসংগঠনকে মজবুত করতে চাইছি।

পি এম : প্রশিক্ষণ শিবির এবং আপনাদের পরিচালিত কর্মশালা সম্পর্কে বলুন। তার ফল কি রকম পেয়েছেন?

লেঙ : জননাট্য মণ্ডলীর সাহায্যে ১৯৯৮ ও ২০০১ সালে দণ্ডকারণ্যে দুটি বড় প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। ২০০২ সালের মে মাসে সর্বভারতীয় কর্মশালার পর আমরা ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে 'আসুন, আদিবাসী শিল্পকে আমরা বিপ্লবীকরণ করি' শিরোনামে দণ্ডকারণ্যব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করি। প্রতিনিধি দলের সামনে তাঁদের মতামতের জন্য চেতনা নাট্য মঞ্চের খসড়া ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করি। দণ্ডকারণ্যের অসংখ্য ধরনের নাচের মধ্য থেকে আমরা কয়েকটির বিপ্লবীকরণ করি। সেগুলো সঠিকভাবে জনগণের কাছে নিয়ে যাই। জনগণকে আমরা প্রশিক্ষিত করি, যাতে তাঁরা আরও বেশি বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন। আমরা প্রতিনিধিদের নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রশিক্ষিত করি এবং তাঁদের সঙ্গে এর ধরন সম্পর্কে ব্যখ্যা করে এটিকে জনগণের মাঝে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। ওই কর্মশালার পর জেলা, এলাকা এবং গ্রাম স্তরে প্রশিক্ষণ শিবির হয়। দক্ষিণ বস্তারে ২০০২ সালে একটি কর্মশালা এবং দুটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে

বিপ্লবী পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেখানে যুবকরা নিজেরাই দল গড়ে তোলে এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে তারা সেই গানগুলো গায়। এ বিষয়টিকে নজরে রেখে উত্তর বস্তার ও পশ্চিম বস্তারের অবুজমাড় এলাকায় বহু প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করি। যুবাদের ধন্যবাদ– বহু এলাকায় নিজ থেকেই তাঁরা গান লিখছেন। ২০০২ সালের মে থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে চেনামের বিভাগীয় এবং জেলা দল কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে প্রায় ১৫০০ শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রধানত যে গ্রামগুলো বিপ্লবী জনগণের কমিটির অন্তর্গত বা যে গ্রামগুলোতে বিপ্লবী জনগণের কমিটি গঠিত হবে, সেসব গ্রামের যুবকদের আমরা প্রশিক্ষিত করেছি। চেনাম সাংস্কৃতিক দলগুলোকে রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেয়। দলগুলো জনগণের কাছে তার বার্তা নিয়ে যায়। এই সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা ইতিবাচক ফল পাচ্ছি।

পি এম : সর্বভারতীয় কর্মশালায় চেনামের ভূমিকা কি ছিল? এই কর্মশালা কিভাবে আপনাদের প্রচেষ্টায় সাহায্য করল?

লেঙ : সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করার পক্ষে এটা ছিল একটি ভালো ব্যাপার। যেহেতু বিভিন্ন রাজ্যে কমরেডরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এই দলিল নিয়ে যখন তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলেন, তখন তা তাত্ত্বিক স্পষ্টতা পেল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে চেনাম তার চিন্তাধারা এবং উপলব্ধি ভাগ করে নেয় এবং দলিলটির উপর বিচার-বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। দণ্ডকারণ্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসেছে, যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, যে উপলব্ধি হয়েছে– সবকিছু নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি। উল্লেখ্য, আজ একটি গণসংগঠন হিসেবে চেনামের কাজ করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে এই কর্মশালার প্রভাবে।

পি এম : আপনারা গ্রামে যুবা মহিলা ও শিশুদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন?

লেঙ : আমরা চেনামের সব সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিই। ১০ বছর বা এর বেশি বয়সীরা চেনামের সদস্য। কর্মকাণ্ড ও উৎসাহ অনুসারে তাঁদের বিশেষ শিবিরে আমন্ত্রিত করা হয়। কম বয়সী ছেলেদের আমরা রণসঙ্গীত শেখানোর চেষ্টা করছি। সাধারণ কথায়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বাড়ানো গান ও নাচ শেখাচ্ছি। আমরা আমাদের মনোযোগ যুবক-যুবতীদের ওপর কেন্দ্রীভূত করছি। প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে আমরা কঠোর পুলিশি দমনের মুখোমুখি হচ্ছি। বিশেষ করে

গড়চিরোলির মতো জায়গায় প্রশিক্ষণ চালানো বড় সমস্যা। আমরা চেনাম সদস্যদের সক্রিয় করতে গ্রামে যাই। কৃষি কাজ, মজুরির কাজ, বনজ সম্পদ সংগ্রহের কাজ নিয়ে দুই, চার বা পাঁচ দিনের একটি সূচি তৈরি করি। আমরা তাঁদের সঙ্গে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করি এবং প্রশিক্ষণ দিই। আমরা তাঁদের এক সঙ্গে বহু গান, নাচ, বা বাদ্যযন্ত্র শেখাই না; একবারে একটি গান, একটি নাচ বা একটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখাই। প্রতিভা, আগ্রহ এবং শিক্ষার যোগ্যতা অনুসারে আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এতে ভালো ফল পাচ্ছি। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে কখনো কখনো আমরা তাঁদের গান লেখাও শেখাচ্ছি। ২০০২ সালে দক্ষিণ বস্তারে আমরা পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়েছিলাম। তাঁদের লিখতে উৎসাহিত করার ওপর আমরা মনোযোগ দিয়েছিলাম। এখানকার জনগণ মুখে মুখে গান বাঁধতে অভ্যস্ত। তাই আমরা গানগুলোর বিপ্লবীকরণ এবং তাঁরা যেন এতে নিজের অনুভূতি এবং সমস্যাগুলো যুক্ত করেন, তার প্রতি আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি। যেসব নারী-পুরুষ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শহীদ কমরেড রণদেবকে নিয়ে 'পালাপিত্তা কেয়মুন্থা' ও 'এরা জান্ডা দ্বাদিমিথে' (লাল পতাকার তলে) গান দুটি লিখেছিলেন। লাল পতাকার তলে জনগণের ক্ষমতা কিভাবে বিকশিত হচ্ছে গানটি তার বর্ণনা দেয়। নিজেদের প্রেরণা, তথ্য এবং অনুশীলন– যা তাঁদের উদ্দীপ্ত করে এই নতুন ক্ষমতার কাঠামোগুলোকে গানের সুরে তুলে ধরতে। নতুন গান লেখায় তাঁদের বিশ্বাস বাড়ছে। এটাই আমরা চাই। তাঁদের জন্য বিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলতে পারা অত্যন্ত জরুরি– আমরা পরম্পরাগত রূপগুলোতে লিখতে ও গাইতে পারছি, যাতে বিপ্লবী আন্দোলন প্রতিফলিত হচ্ছে। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, চেনামের নির্ধারক নীতি হলো– 'জনগণ ইতিহাসের নির্মাতা এবং জনগণ নতুন সংস্কৃতি রচয়িতা'।

পি এম : আদিবাসী সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

লেঙ : এখানকার আদিবাসী শিল্প-সাহিত্য প্রধানত মৌখিক। তাঁদের সাহিত্য মুখে মুখে রচিত। এর সবচেয়ে বড় গুণ– সবকিছুই যৌথ বা সর্বজনীন। জোৎস্না রাতে বিশেষ করে শীতকালে ক্ষেতগুলো যখন চড়চড় করে বেড়ে উঠেছে, বা বর্ষার পর ফসল কাটার আগে পুরো গ্রাম আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে আনন্দে নাচে। আনন্দের সঙ্গে সবাই শামিল হন এতে। এটা একটা সমষ্টিগত অনুভূতি। যেখানে কেউ শামিল হতে পারবে না– এমন কোনো বাধা নেই। যদি কেউ গান গাইতে শুরু করেন, সবাই সেই কোরাসে শামিল হন।

আদিবাসী সংস্কৃতিতে নৃত্যের সঙ্গে গান আছে, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য আছে; কিন্তু গান, বাদ্যযন্ত্র এবং নৃত্যের মিশ্রণ নেই। এটি বিকশিত করতে হবে। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে যখন জনগণ নৃত্য করেন, তা অত্যন্ত ছন্দময় এবং দেখলে মনে হয় তাঁরা যেন একই সত্তা! তাঁদের বাদ্যযন্ত্রগুলো অত্যন্ত সুরেলা এবং শ্রুতিমধুরভাবে তাঁরা তা বাজান। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো– প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বজনীন উদ্দীপনা। অন্যান্য জায়গার মতো এখানে কোনো পরজীবী শ্রেণির দরবারি শিল্পী লেখক বা কবি নেই। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পি এম : এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চেনামের কার্যক্রম কি?

লেঙ: এই সর্বজনীনতার যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি। তাই যখন আমরা চেনামের সাংস্কৃতিক দল গঠন করি, তখন আমরা তার সদস্য সংখ্যাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি। সংখ্যা আট বা দশ কিছুই হতে পারে। বিশেষ করে দল যখন গ্রামে ঢোকে, তখন পুরো গ্রাম সেখানে এসে জড়ো হয়। তাঁরা সবাই নাটক করছেন, অথবা কয়েকজনকে নিয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করাচ্ছেন। তাই জনগণ অংশগ্রহণকারী হয়ে যাচ্ছেন। চেনাম পুরো গ্রামকে যেভাবে নাচে অংশগ্রহণ করায়; এইভাবে তারা নাটকও বিকশিত করছে। যখন একজন গায়ক গান করেন, তখন কেবল দলের সদস্যরাই নন, পুরো গ্রাম কোরাসে অংশগ্রহণ করে। গান আমরা সর্বজনীনভাবে শেখাচ্ছি। আমরা একটি নতুন রূপ প্রবর্তন করেছি। মৌখিক পরম্পরায় একজন মনে মনে গান বাঁধেন, অন্যজন তার উত্তর দেন। এখন আমরা যা করছি, তা হলো– কবিতার প্রথম স্তবক একজন তৈরি করছেন এবং কবিতার গতিমুখ তিনি তৈরি করছেন, অন্যজন পরবর্তী স্তবক রচনা করছেন এবং আরও দুই তিনজন সেটিকে অব্যহত রাখছেন। তারপর আরও একজন আসছেন। তাঁরা সবাই মিলে যৌথভাবে একটি সর্বজনীন গান লিখলেন। পুলিশ এবং তার দমনের ওপর লেখা 'নারায়ণপুর আতুম দি বথাল নাইকু কেয়ানথা' এই ব্যাঙ্গাত্মক গানটি যৌথতার পদ্ধতিতে লিখিত। সম্মিলিতভাবে লিখিত বহু গান রয়েছে। সেখানে মৌখিক পরম্পরা রয়েছে। মন থেকে তাঁরা যে গানগুলো লিখেছেন, সেগুলো আমাদের নতুন গান। যেখানে তাঁরা বিপ্লবী অনুশীলনকে জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মেশাচ্ছেন। সেগুলোকে আমরা লিখিত রূপ দিচ্ছি। সবকিছুই সর্বজনীনভাবে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা কবিতা লেখাও বিকশিত করার চেষ্টা করছি।

পি এম : আদিবাসী শিল্প-সাহিত্যকে কিভাবে রেকর্ড করছেন ?

লেঙ : আমরা প্রাচীন শিল্পরূপ, যেমন– ঘোটুল পাটা (আদিবাসী সঙ্গীত) এবং ঘোটুল পিটো (আদিবাসী নৃত্য) সম্পর্কে বিশেষভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। আমরা ইতিহাসে পড়েছি– আদিম জনগণ তাঁদের আনন্দ এবং অন্য

অনুভূতি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন। এখনো আমরা মুরিয়া আদিবাসীদের মাঝে তা দেখতে পাই; যা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি ঘোটুল সংস্কৃতিও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবল হাতেগোনা কয়েকজন ঘোটুল পিটো গুরু রয়েছেন। যখন আমরা ওই এলাকাগুলোতে যাই, আমরা জনগণের কাছে খোঁজ খবর নিই– পুরনো শিল্পী কারা, গ্রামে কতজন প্রবীণ রয়েছেন, কি ধরনের শিল্পীরা এলাকায় রয়েছেন ইত্যাদি। আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করি এবং সময় কাটাই। তাঁদের শিল্প অধ্যয়ন করি। আমরা বিয়েতে শামিল হই। আমরা তাঁদের গ্রামের মেলা 'করসাদ'এ যাই। শিশুর জন্ম, মৃত্যু, নবজাতকের নামকরণ– সব অনুষ্ঠানে আমরা যাই, ক্যামেরা থাকলে ফটোগ্রাফ নিই, অডিও রেকর্ড করে রাখি। গত ৪-৫ বছর ধরে সংরক্ষণের কাজ জোরদারভাবে চলছে। দণ্ডকারণ্যের সাংস্কৃতিক উপসমিতি (ডিসিএসসি) গঠনের পর এ কাজে গতি এসেছে।

পি এম : চেনামে নারীদের ভূমিকা কি?

লেঙ : বিবাহের সময় এবং উৎসবে বা সন্ধ্যায় যুবকরা যখন ঘোটুলে জড়ো হন, তখন তাঁরা গান করেন। যদিও তাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোনো প্রশিক্ষণ পান না, তাও আদিবাসী নারীরা সুমধুর কণ্ঠে গান করেন। দণ্ডকারণ্য আন্দোলনে ৫০ শতাংশ নারী রয়েছেন চেনামে গ্রাম স্তর থেকে বিভাগ স্তর পর্যন্ত নারীদের সংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি। চেনামের নেতৃত্বকারী কার্যনির্বাহীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নারী রয়েছেন। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীরা যতক্ষণ বিবাহিত, ততক্ষণ তাঁরা মুক্ত। তাই সাধারণভাবে শিল্পে নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। চেনামের পক্ষে এটা একটা ইতিবাচক অবস্থা। সাহিত্য লেখার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা বাড়ছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা বাড়ানোর জন্য চেনাম বিশেষ নারী দল গঠন করেছে। দক্ষিণ বস্তারে এটি প্রথম গড়ে ওঠে। তাঁদের মাধ্যমে আমরা ভালো ফল পাচ্ছি। প্রত্যেক গ্রামে নারী শিল্পীরা মনে করেন– এটি তাঁদের দল। বহু নারী যুক্ত হয়ে এটিকে সুদৃঢ় করে তুলছেন। এলাকার বিভিন্ন বিভাগে নারী দলের সংখ্যা বাড়ছে।

পি এম : আপনাদের পোশাক এবং বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বলুন।

লেঙ : নৃত্যের জন্য আমাদের পোশাক আছে। আপনারা জানেন, নাটকে দৃশ্য এবং চরিত্র অনুযায়ী পোশাক দরকার। যদিও আমরা জনপ্রিয় শিল্পরূপ ঘোটুল পিটোতে গুরুর যে পোশাক ব্যবহার করি, আমাদের কর্মীদের তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাঁরা মনে করেন তাঁর পোশাক ততটা আকর্ষণীয় নয়। আগামীদিনে চেনাম পিটো গুরুর একটি বিশেষ পোশাক ব্যবহার করবে। যেহেতু আমরা দণ্ডকারণ্যের কাজ হিসেবে ঠিক করেছি– মুক্তাঞ্চল গড়তে হবে;

তাই এখানকার সবকিছুই জনযুদ্ধ এবং সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, এমনকি পোশাকও। দমনের মাঝেই আমাদের অনুষ্ঠান করতে হবে; তাই আমরা এমন একটা পোশাক বাছাই করেছি, যা জঙ্গলের সঙ্গে মিশে যায় এবং আমাদের রক্ষা করে। আমাদের শিল্পীরা সবুজ লেহেঙ্গা পরেন। তার উপরে একই রঙ্গের একটা গেঞ্জি বা জ্যাকেট পরেন। মেয়েরা তার উপরে অর্ধেকটা শাড়ি পরেন। এটি সবুজ জঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে এবং তার সঙ্গে মিশে যায়। দণ্ডকারণ্যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এখানে ১৮ ধরনের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। যার মাত্র কয়েকটি এখনো ব্যবহৃত হয়। এগুলোই আমরা ব্যবহার করছি, তার সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও। বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বহীন করে দেখা যাবে না। আমাদের তরফ থেকে কোনো বাধানিষেধ নেই যে, কেবল এখানকার বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। আমরা বেশ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করি। সুর কখনো গান বা তার গীতিকাব্য ছাপিয়ে যাবে না। তাই আমরা কর্মসূচির প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক ও স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র দুটোই ব্যবহার করি। এগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি হলো– ডাফলি ও মেলাম (বায়ুযন্ত্র)।

পি এম : জনগণের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন? আপনাদের কাজে গণ-লাইন কিভাবে ব্যবহার করেন ?

লেঙ : এই ব্যাপারে চেনাম অত্যন্ত ভাল ফল পাচ্ছে। যখন কোনো দল গ্রামে যায় হাসিমুখে তাদের চারধারে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই জড়ো হন। হৃদয়ভরা স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাঁরা দলের যত্ন নেন। তাঁদের পৌঁছানোর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই নিজেদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে নেন, যাতে তাঁরা দলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয়। চেনামের সক্রিয় কর্মীরা তাঁদের ঘরেও যান, তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে যান, তাঁদের সঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ করেন– তাঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বিকশিত করেন। চেনাম গণ-লাইন এবং শ্রেণী-লাইন অনুসরণ করে। জনগণের দুঃখকষ্ট, সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান চেনাম তার গান, নাচ, এবং নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এটি জনগণের চেতনা উন্নত করে, সমাজের কোণায় কোণায় ঢুকে পড়া মধ্যস্বত্বভোগী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। জনগণের সমস্যা নিয়ে তাদের কাছে থেকে চেনাম সাহিত্য বিকশিত করে।

পি এম : চেনাম কি ধরনের দমনের মুখোমুখি হচ্ছে ? আপনারা কিভাবে তা কাটিয়ে উঠছেন?

লেঙ : দমনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে চেনাম– কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক সবরকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দমনের শিকার হয়েছে ভীষণভাবে। চেনামের

প্রতি শত্রুর নজরদারি প্রতিদিনই বাড়ছে। যদি তারা জানতে পারে যে, কোথাও চেনামের কোনো অনুষ্ঠান আছে, তাহলে তাদের বাহিনীকে সক্রিয় করে দেয় এবং চিরুণী তল্লাশী শুরু করে। কয়েকবার চেনাম দল যেখানে ক্যাম্প করেছিল, তারা সেই জায়গা ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু জনগণের সমর্থনের ফলে সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। গড়চিরোলির মতো এলাকায় তাদের ওপর গুলিও চালানো হয়েছে। যখন গ্রামের যুবারা উৎসব বা বিবাহে সর্বজনীন নাচে অংশ নেন, শত্রুবাহিনী চেনাম সদস্য ভেবে নির্বিচারে তাদের ওপর গুলি চালায়; কিন্তু জনগণ চোখের মণির মতো চেনামকে পাহারায় রাখেন। গণমিলিশিয়ার যথেষ্ট সমর্থন পায় চেনাম। বিশেষ অবকাশে পিএলজিএ বাহিনী নিরাপত্তা দেয়। গণমিলিশিয়ার নিরাপত্তায় জনগণের দাবিতে থানা থেকে এক দুই মাইলের দুরত্বেও চেনাম অনুষ্ঠান করে। ঘোর দমনের মধ্যেও জনগণের শিল্পীরা বিপ্লবী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৬ আগস্ট ২০১৩ সালে ছত্তিশগড় সরকার চেনামকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

পি এম : এখন 'ঝংকার' সম্পর্কে কথা বলা যাক। এটি গঠনের পটভূমি এবং আপনাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলুন।

লেঙ : ১৯৮০ সালে দণ্ডকারণ্য আন্দোলনের শুরু থেকেই বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজন লেখক-শিল্পী ছিলেন এবং তাঁরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রূপে কিছু সাহিত্য রচনা করেন। এগুলোর সবই আন্দোলনের প্রয়োজনে লেখা। বিপ্লব সবকিছুই দাবি করে। কে সেই দাবি পূরণ করবে? (বিপ্লবের) বাইরের কয়েকজন তা পুরণ করতে পারেন না। বিপ্লব এবং জনগণের দাবি বিপ্লবী আন্দোলনকেই পুরণ করতে হবে– বিপ্লবী আন্দোলন কেবল তখনই সব ক্ষেত্রে বিকশিত হতে পারে। ভাষা এখানে আলাদা। সমস্যাগুলো আলাদা, পশ্চাৎপদতা আলাদা আলাদা। তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এসব নজরে রেখেই সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে। এই লেখক-শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের লেখায় জনগণের জীবনের যে গাঁথা বলা হয়েছে, তা প্রকাশের জন্য আমরা একটি সাহিত্য পত্রিকার কথা ভাবি। এর ফলে ১৯৯৪ সালের জুলাই-আগস্টে 'ঝংকার' আত্মপ্রকাশ করে। এখানকার সব কমরেডরা এর প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দমনের মাঝেই তা বের করা হচ্ছিল। শত্রুর আক্রমণ যেহেতু বহুমুখী, আমাদের প্রতিরোধও ছিল বহুমুখী। কমরেডরা এখানে গোন্ডি, হিন্দি, মারাঠি, বাংলা এবং তেলেগু ভাষায় লেখেন। এটা ঝংকারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। সেখানে আদিবাসীরা রয়েছেন, রয়েছেন অনাদিবাসীরাও, তাদের মধ্যে বাঙালি, তেলেগু, মারাঠি এবং ওড়িয়া– অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীয়তার লোকেরা বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীরা দণ্ডকারণ্য আন্দোলনে রয়েছেন। অতএব 'ঝংকার' বহুভাষী পত্রিকা। জনগণের মধ্য থেকে আমরা লেখকদের তৈরি করতে চাইছি। শুধু তাই নয়, আমরা কর্মীদের মধ্য থেকে

লেখকদের তৈরি করতে চাইছি। এমনিতেই জনগণ মুখে মুখে গান রচনায় দক্ষ। প্রয়োজন হলো– তাঁদের বিপ্লবীকরণ এবং লেখকে পরিণত করা। তাঁরা এই গানগুলোতে নিজেদের সমস্যা, দুঃখকষ্ট, আনন্দ ও অনুভূতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেন। মূলত আমরা তাঁদের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছি, যাতে তাঁরা সমস্যার সমাধানও লিখতে পারেন। চেনাম সদস্যরাও এখন লিখতে পড়তে শিখছেন। আমরা তাঁদের লেখা সংশোধন করে ছাপছি এবং তাঁদের বিকশিত করছি। এই প্রচেষ্টায় কিছু ঘাটতি আছে। নতুন লেখকরা যা লিখছেন, পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে তাঁদের বিকশিত করতে আমরা পারছি না। এটা সংশোধন করতে পারলে আমরা ভালো ফল পাবো।

পি এম : ঝংকারের দশ বর্ষপূর্তি সংখ্যায় আপনারা কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন, কি অর্জন করতে চাইছেন?

লেঙ : ঝংকারের দশ বর্ষপূর্তি একটি খুশির অবকাশ। আমাদের লেখকরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এই সংখ্যায় তা বলা হয়েছে। মূলত লেখাগুলো সেই ধাঁচেরই। তাই আমাদের তা বদলাতে হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য জনগণের সমস্যা তুলে ধরতে লেখকদের সাহায্য করা, নতুন সাহিত্যিক আঙ্গিকে অসাধারণভাবে তা লেখা। বহু সমস্যা রয়েছে। যদিও এই সমাজে কেবল সীমিত সাহিত্যিক রূপ রয়েছে। বাইরের পৃথিবী থেকে নতুন নতুন সাহিত্যিক আঙ্গিক আমরা নেব। চিন্তার আদান-প্রদান ছাড়া কোথাও বিকাশ হয়নি। শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিকে আমরা জনগণের আত্মত্যাগ, সংগ্রামী অনুভূতি ও সমস্যার কথা অভিব্যক্ত করবো। এসব প্রয়োজনকে আমরা ধরতে পারছি না। তাই আমাদের লেখকদের নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা এসব বিষয়ে আলোকপাত করেন। 'ঝংকার' এমন লেখক তৈরি করার কাজ করবে।

পি এম : দণ্ডকারণ্যে জনযুদ্ধ বিকশিত করার লক্ষ্য সম্পর্কে আপনারা স্পষ্টভাবে কি বলছেন?

লেঙ : এই এলাকায় যদি আমাদের কিছু অর্জন করতে হয়, তাহলে প্রথমে আমাদের নিজেদের বিকশিত করতে হবে। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো– জনযুদ্ধের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া। জনযুদ্ধ যখন প্রারম্ভিক স্তরে ছিল, তখন লেখক-শিল্পীরা এগিয়ে এসে জনগণকে তাতে যুক্ত হওয়ার জন্য তৈরি করেছেন। এখন তাঁদের লেখার স্তর, ভাষা এবং স্টাইল উন্নত করবেন– যাতে তাঁদের সব লেখা যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ঘাঁটি এলাকার প্রেক্ষাপট নিয়ে এখানে আমরা কাজ করছি, জনগণকে লেখার বিভিন্ন আঙ্গিকে ঘাঁটি এলাকা বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। জনগণের ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হয় বলতে হবে– ক্ষমতার জন্য দুটি শ্রেণি কিভাবে লড়াই করে এবং বিপ্লবের অর্থ হলো– জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা। এসব এলাকায় জনগণের

চেতনা তুলনামূলকভাবে যেহেতু উঁচু, তাই লেখার স্তরও সেই অনুপাতে উঁচু হতে হবে। তাঁরা জনগণের স্তর উঁচু করবেন। আমাদের বিপ্লবী লেখকরা সাধারণ জনগণ থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন এবং জনগণের ভবিষ্যৎ বদলের দিশারি হবেন।

পি এম : সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপনাদের প্রচেষ্টাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) গঠন কিভাবে অগ্রসর করেছে ?

লেঙ : পূর্বতন পি ডব্লিউ ও এমসিসি এই দুটি প্রধান ধারার মিলন সব খেটে খাওয়া মানুষের আশা বাড়িয়ে দিয়েছে। তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও লেখক-শিল্পীদের প্রেরণা যুগিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে। এগুলো আমাদের আরও বিকশিত করতে অনেক সাহায্য করবে। গত তিরিশ বছর ধরে অন্য সব এলাকায় সব লেখক-শিল্পীরা ঘাঁটি এলাকার যে প্রেক্ষাপট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখা খুবই কাজে লাগবে। আমাদের এখানকার অভিজ্ঞতা তাঁদের শিক্ষার কাজে লাগবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু তখন তা দুটি পার্টির নেতৃত্বে হয়েছে, এখন তা ঐক্যবদ্ধ পার্টির সুদৃঢ় নেতৃত্বে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যা দ্রুততার সঙ্গে নয়াগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে সাহায্য করবে।

পি এম : নয়াগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে বাইরের লেখক-শিল্পীদের প্রতি আপনারা কি আহবান রাখছেন?

লেঙ : (হেসে) সংগ্রামরত জনগণ সংগ্রামরত জনগণকে কি বলেন? আমরা এখানে লড়াই করছি। আমরা বাকি সবাইকে লড়াই করতে বলছি। আমরা সাম্রজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী, নয়াগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য লড়াই করছি। সমগ্র জনগণকে আমাদের আহ্বান– লড়াই করে শোষক শ্রেণির সংস্কৃতিকে উৎখাত করতে সাহসী হোন। আমাদের লক্ষ্য যেহেতু অভিন্ন; তাই আসুন, এই লড়াই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে লড়ি। সংগঠিত হয়ে আমরা নয়গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ি। আমরা পিপলস মার্চকে লাল সালাম জানাই। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও পিপলস মার্চ এখানে এসে এই ইন্টারভিউ নিয়েছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে দেশের এবং দেশের বাইরের জনগণকে জানানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

##

অরুন্ধতি রায়-এর "পরমানন্দ" ও আজকের ভারত

– চার্বাক

[নোট:
নিবন্ধটির প্রথম রচনাকাল মধ্য-মে, ২০২০। তবে জুলাই ৩য় সপ্তাহে প্রকাশের আগে এতে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। জুলাই মাসে এটি পার্টির ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছিল।

– সম্পাদনা বোর্ড, 'সহযোদ্ধা']

অরুন্ধতি রায় ভারতের সুপরিচিত লেখক। ২০ বছর আগে তার প্রথম উপন্যাস "গড অফ স্মল থিংস" যখন বিশ্ব-সাহিত্যের দামী সাহিত্য পুরস্কার "বুকার" জেতে তখন তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে যান। পশ্চিমা বিশ্বে তার খ্যাতি ও বিক্রি অনেক বেড়ে যায়। তার ব্যতিক্রমী ইংরেজি ভাষা বা অপূর্ব শিশু-মনস্তত্বের বর্ণনা অথবা নারী-প্রশ্নে সুগভীর সহমর্মীতামিশ্রিত বেদনাদায়ক কাহিনি বলার দক্ষতার কারণেই শুধু সেটা হয়নি। বরং সে-উপন্যাসে ভারতের কেরালার এক খ্রিষ্টান পরিবারের আপাত রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন কাহিনি এবং সংশোধনবাদী-শাসিত সিপিএম-এর প্রকৃত গণবিরোধী চরিত্রের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে আনার কারণও সেখানে কাজ করেছিল। পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী (সম্ভবত ধর্মবাদবিরোধীও) দৃষ্টিভঙ্গির পাঠকরা উপন্যাসটিকে আপন করে নিয়েছিল। যাতে ভারতের জাতপাত প্রথা ও অস্পৃশ্যতার অভঙ্গুরতার উন্মোচন থাকলেও, এমনকি পুলিশী চরিত্রের কিছু বর্ণনা থাকলেও, ভারতের শাসকশ্রেণিকে ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে, এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদেরকে সেটা সেভাবে আঘাত না করায় সেই পাঠকেরা স্বস্তিতেই ছিলেন। অনেকেই তখন তার কাছ থেকে আরো আরো উপন্যাস আশা করতে থাকেন।

কিন্তু তারপর বহু বছরেও তিনি আর কোনো উপন্যাস লিখেননি। কেন? সেটা একটা বড় প্রশ্নই বটে।

তবে তিনি লেখালেখি থেকে বিরত ছিলেন তা নয়। বরং বহুতই লিখেছেন। বিগত ২০ বছরে যদি আমরা তার লেখালেখির প্রধান কয়েকটির উপর কিছুটা চোখ বুলাই তাহলে দেখতে পাবো যে, এই সময়কালে অরুন্ধতির দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় ধরনের প্রগতিশীল বিকাশ ঘটেছে। অবশ্যই তাতে ভারতীয় রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির বিরাট অবদান রয়েছে। তারা জনগণের উপর যে শোষণ-অত্যাচার-অন্যায় জারি রেখেছে, সেটা অরুন্ধতির মত একজন সাহসী সত্যসন্ধানী লেখককে প্ররোচিত করেছে ভারতের বড় বুর্জোয়া শ্রেণির অবর্ণনীয় লুট, পাহাড়সম অর্থ ও ভোগ, তাদের

উন্নয়নের যাঁতাকলে পিষ্ট পরিবেশ প্রকৃতির সর্বনাশ, তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র উন্মোচন, আদিবাসী ধর্মীয়-সংখ্যালঘু নারী দলিত এবং কৃষকের দুর্বিসহ জীবনকে তুলে ধরে বিবিধ ধরনের রচনা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হতে।

সে সময়টাতে (শতাব্দীর প্রথম দশকে) একদিকে মধ্য ও পূর্ব ভারতের জঙ্গলে মাওবাদী নেতৃত্বে গণযুদ্ধের বিশাল বিস্তৃতি এবং অন্যদিকে কাশ্মীরে জাতিগত মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম উভয়টিরই একটি বড় উত্থান ঘটে। যাকে দমনের জন্য 'গণতান্ত্রিক' ভারতের রাষ্ট্র যে বর্বরোচিত সামরিক অভিযান ও গণহত্যা ঘটায় সেটিও তার মত একজন সৃজনশীল মানবিক লেখকের মননকে গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করে। নিশ্চয়ই তিনি কাশ্মীরের ধর্মীয় মৌলবাদী ও পাকিস্তানি মদদের দিশাহীন সংগ্রাম ও তার বিশাল মূল্য দ্বারা হতাশ ছিলেন এবং মাওবাদী আন্দোলনের শক্তি ও কর্মসূচি তাকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করেছিল। যা তাকে এগিয়ে দেয় মাওবাদী মুক্তাঞ্চল ছত্রিশগড়ে ঢুকে সেখানে এক ঝুঁকিপূর্ণ সফর করা ও মাওবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনে। সফর শেষে তিনি "কমরেডদের সাথে পথচলা (ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেডস)" নামে একটি আলোচিত পুস্তক লেখেন। ফলে ধরে নেয়া যায় যে, তিনি এ সময়কালটিতে নিজেকে কমিউনিস্টে পরিণত না করলেও কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদের থেকে মাওবাদের পার্থক্যকে অনেক বেশি করে ধরতে পেরেছেন। এবং মাওবাদী আন্দোলনের ন্যায্যতা, গণসম্পৃক্ততা, ব্যাপক বীরত্ব ও ত্যাগ, নারী আদিবাসী দলিত ও কৃষকদের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট বিষয়ে তার এক ধরনের সহানুভূতি গড়ে ওঠে। তিনি নতুন করে তার দৃষ্টিভঙ্গি না গুছিয়ে আর কোনো উপন্যাস লিখতে হয়তো সক্ষমও ছিলেন না। তদুপরি তিনি যেখানে যেতে চান, এবং যা লিখতে চান, সেটা গণতান্ত্রিক ভারতে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল সেটা তিনি মাওবাদী ঝোঁকা লেখালেখির সময়টাতেই বুঝতে পেরেছিলেন। তবে মাওবাদী আন্দোলনের ধাক্কা খাওয়া, এবং কাশ্মীরের সেই সময়কার উত্থানটি মার খেয়ে যাবার পর তার লেখাটির জন্য প্রস্তুতি নেয়ার অবকাশ ঘটে। হয়তো তিনি কৌশলগত কারণে দিকনির্দেশনামূলক উপন্যাসের বদলে বাস্তবচিত্রভিত্তিক উপন্যাস লিখতে মনস্ত করেন বা সেটাই তার শৈল্পিক অবস্থান।

কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দ্রুত ঘটে চলা পরিবর্তন– যেমন, হিন্দুত্ববাদের দ্রুত বিকাশ ও ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হওয়া, রাজধানী দিল্লির শাসন থেকে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েরই প্রস্তান এক নব সেমি-গান্ধীবাদী সেমি এনজিও-ধর্মী কেজরিওয়াল দ্বারা– যার পেছনে স্পষ্টতই বড় বুর্জোয়ারা দেদার টাকা ঢাকছিল, দুর্নীতির ব্যাপকতার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ, বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে সামাল দেয়ার অভিপ্রায়ে কেজরিওয়াল ছাড়াও গান্ধীবাদী অহিংস বুর্জোয়া-ক্রীড়নকদের মাঠে নামানো, মাওবাদী আন্দোলন ও কাশ্মীর উভয় জায়গাতেই আন্দোলন বড় ধরনের ধাক্কা খাওয়া– ইত্যাদি তাকে স্থির হতে নিশ্চয়ই দেয়নি।

কারণ, মাওবাদী বিষয়ে লেখার পর তার প্রধান বিষয় নির্ধারিত হয় নববিকশিত ফ্যাসিস্ট হিন্দুত্ববাদ ও কাশ্মীর, বিশেষত কাশ্মীর। সেটা ছিল অন্য দিক থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, সে ব্যাপারে হিন্দুত্ববাদের বিকাশ তার জীবনহানির কারণ হতে পারে, তাকে পাকিস্তানের বা হিন্দু-বিরোধী বিদেশি এজেন্ট বানানো যেতে পারে (পারিবারিকভাবে তিনি হিন্দু বাবার সন্তান হলেও তার মা ছিলেন কেরালার এক সিরিয়ান খ্রিষ্টান নারী, যার কাছে অরুন্ধতী পালিত হয়েছেন), তাকে ইসলামী-মৌলবাদী সন্ত্রাস-সমর্থক বলা যেতে পারে, বিশেষত তাকে রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাকে আইনি পথে দমনের প্রচেষ্টাও রাষ্ট্র করতে পারে। সুতরাং এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য অনেক পূর্ব-প্রস্তুতি ও ভাবনা ছাড়া কারো পক্ষে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়।

আর এর সাথে অরুন্ধতী সর্বদাই যে বিষয়দুটোতে সোচ্চার– ভারতের জাতপাত-অস্পৃশ্যতা প্রথা এবং নারী-প্রশ্ন ও তার বিভিন্ন রূপ হিসেবে বিবাহ-বহির্ভূত বা বর্ণ-বহির্ভূত বিবাহ ও তাদের সন্তানদের প্রশ্নে ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও বুর্জোয়া রাজনীতির তীব্র সমালোচনা, এবং হিজড়া-প্রশ্ন, এসবকেও এখানে সংযুক্ত করে উপন্যাসটিকে একযোগে বর্ণবাদ সমর্থকদের আক্রমণের লক্ষ ও নারী-প্রশ্নের নগ্ন চরিত্র উন্মোচনের ঝুঁকি সম্পন্ন এক বিবৃতিতে পরিণত করে তার নিজের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলেছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন, এবং ভারতের মাটিতে বসে, মাওবাদী বহির্ভূত একজন বুর্জোয়া স্তরের বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসেবে, এক অসম সাহসী উপন্যাস ("মিনিস্ট্রি অব আটমোস্ট হ্যাপিনেস– Ministry of Utmost Happiness"; বাংলায় "পরমানন্দ মন্ত্রণালয়") তিনি লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। নিশ্চয়ই বিশ্বখ্যাতি থাকায় তার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়েছে। এবং খ্রিষ্টান পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড ও কিছু পরিমাণে অদৃঢ় সত্ত্বেও সারমর্মে বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ও মানবদরদী অবস্থান তাকে কিছুটা নিরাপদ রেখেছে। নতুবা তাকে বহু পূর্বেই কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের হাতে, অথবা রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে কারো দ্বারা মরতে হতো, অথবা তার উপন্যাসটিকে আলোর মুখ দেখানোর জন্য কোনো প্রকাশক রাজী হতেন না। প্রকাশকদের ঝুঁকির বিপরীতে তাদের লাভের অংকটাও তাদেরকে প্রলোভিত করার জন্য কম দায়ী ছিল না, কারণ, অরুন্ধতীর দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশ হচ্ছে, এই সংবাদটিই উপন্যাসটির জন্য হাজার হাজার কপির আগাম অর্ডার এনে দেবে তাতে তারা নিশ্চিত ছিল।

সেটা হয়েছে, বাজার পেয়েছে, কিন্তু 'স্মল থিংস্'-এর মতো করে হয়তো নয়। কারণ, যে-পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা সাহিত্য-শান্তি-অর্থনীতি ইত্যাদির জন্য বিশ্ব-খ্যাতি ও বিপুল অর্থের পুরস্কারগুলোর হোতা তারা ইতিমধ্যেই জানতো অরুন্ধতীর বিকশিত দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচার তাদের জন্য একটুও উপযোগী-তো নয়ই, বরং বিপদের কারণ। বিশেষত, যে-ভারতের বিশাল বাজার, সস্তা শ্রমশক্তি আর বিপুল বনজ ও খনিজ

সম্পদ, উপরন্তু তার বিশাল সামরিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে একটা লোভনীয় পিঠার খনি, তাকে বিব্রত করতে পারে, তৃতীয় বিশ্বে তাদের গণতন্ত্রের তুলনাহীন মডেলের গায়ে কালিমা লাগাতে পারে তেমন কিছু তারা ভাল কোনো প্রচারে দিতে পারে না। তাই, দেখা যাবে যে, ২০ বছর আগের স্মল থিংস-এর চেয়ে বহুগুণে বেশি রাজনীতি-সচেতন ও সমাজ-সচেতন, অপূর্ব ভাষা, সুব্যবস্থিত একেকটি বাক্যে ভারত সাম্রাজ্যের একেকটা ক্লেদাক্ত পুরো অধ্যায়কে পুরে দেবার অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতা এবং তার উপন্যাসটির অসম সাহস ও ব্যতিক্রমী চরিত্র সত্ত্বেও, অনেক নোবেল-প্রাপ্ত সাহিত্য হয়তো যার সাথে তুলনীয় নয়, সেটি তেমন কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনো সম্ভবত পায়নি। দ্বিতীয়বার বুকার দেবার দৃষ্টান্ত থাকলেও তাকে বুকারও পুনরায় দেয়া হয়নি।

যাহোক, তবুও বিশ্বের বহু জনগণ লাইন ধরে তার এই বই কিনেছেন, পড়েছেন, হয়তো অনেকেই পূর্ণ একমত হননি, কিন্তু তারা অনেকটা দেখেছেন ভারত নামক সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ও তার বিপুল 'উন্নয়নে'র পেছনে কী করুণ সত্যগুলো লুকিয়ে রয়েছে।

অরুন্ধতী লেখেন ইংরেজিতে। তার এ উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রমিত হোসেন, যিনি আগের উপন্যাসটিও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য সেটি অন্য আরো কারো দ্বারাও অনুদিত হয়েছিল। অন্যধারা বর্তমানটির প্রকাশক। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮ সাল। পৃষ্ঠা ৪৬৩, দাম ৫০০ টাকা।

উপন্যাসটি প্রকাশের পর আমাদের দেশের কিছু পত্রিকার কলামে এর উপর কিছু আলোচনা হয়েছে, খুব বেশি ও বিস্তৃত নয়। তার মাঝে বাংলাদেশের একজন চলতিধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসিকদের একজন, আনিসুল হক, স্বীকারোক্তির মতো করে যা বলেছেন তার সারমর্ম এমন হতে পারে যে, আমরা কতটা বাজে লিখি, আর উচ্চমানের সাহিত্য কী হতে পারে সেটা এ উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায়। যদিও এটা গোপন নয় যে, জনাব আনিস ভারতের প্রকাশ্য দালাল শেখ হাসিনা ও ভুয়া পিতা ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবের একজন ভক্ত, '৭১-এর আওয়ামী-চেতনার একজন ধারক, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অচল-হয়ে-যাওয়া মতাদর্শে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একজন লেখক-সাংবাদিক। এবং এটাও অনেকে জানেন যে, গত বছর অরুন্ধতী বাংলাদেশে যখন এসেছিলেন তার বন্ধু, হাসিনা-সরকার দ্বারা নিপীড়িত আলোকচিত্রী, শহীদুল হকের মুক্তির চেষ্টায়, তখন এই সাংবাদিক-লেখকসহ আরো কিছু সাংবাদিক চেষ্টা করেছিলেন শেখ হাসিনার সাথে তার একটা মিটিঙ করার জন্য তাকে রাজী করানোর কৃতিত্ব নিতে, যদিও সেটা ব্যর্থ হয়।

আমরা যখন অরুন্ধতী সম্পর্কে, বিশেষত তার এ উপন্যাসটি সম্পর্কে অল্পকিছু আলোচনা করছি এখানে, তখন প্রমিত হাসানের অনুবাদটির ভিত্তিতেই। এতে মূল উপন্যাসের মাধুর্য ও গভীরতা কতটা রক্ষা হয়েছে বা খর্বিত হয়েছে সেটা যারা

ইংরেজিতে পড়েছেন তারাই বলতে পারবেন। তবে প্রমিত হাসান এমন একটি উপন্যাস অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ পেতে পারেন। তার বাংলা থেকেই বোঝা চলে যে, মূল উপন্যাসটির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি কতটা শক্তিশালী। প্রমিতের কঠোর পরিশ্রমের প্রকাশ বোঝা যায় অনুবাদটিতে। খুবই জটিল ও নতুন শব্দকে, শব্দমালাকে ও বাক্যকে তিনি সুখপাঠ্য করে তুলে ধরার যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছেন। তাসত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় সম্ভবত দুর্বোধ্যতা এড়ানো যায়নি, অন্তত ২/১টি জায়গায় ভুল অর্থ হয়েছে বলে ধারণা হয়। তথাপি বাজার-চলতি একশ'টি উপন্যাস লেখার চেষ্টা না করে তিনি যে এই বিরাট কাজটি করেছেন সেজন্য তিনি বহু স্যালুট পেতে পারেন।

প্রমিতের এ অনুবাদ-কর্মটির কারণে তার ভারতীয় ভিসা ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ হবে কিনা সেটা দেখার, তবে তিনি এক অসাধারণ কাজ করেছেন বাংলা সাহিত্যের জন্য। কারণ, খোদ বাংলা ভাষাতেই এ ধরনের কোনো উপন্যাস আছে বলে মনে হয়না, তার ভাষা মাধুর্যের জন্য নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই, ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতির অনেক কিছুকে কেউ এমন করে বলেছেন কিনা, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, মাওবাদী বাদে, তাতে সন্দেহ রয়েছে।

অরুন্ধতী সম্পর্কে আরেকটা বিষয় না বলে উপন্যাসটির গল্পে প্রবেশ করা যায় না। প্রথমত, তিনি অকমিউনিস্ট, মাওবাদী নন, বিপ্লবী নন। দ্বিতীয়ত, তার এ উপন্যাসটি কৃষক, শ্রমিক বা সাধারণ পাঠকদের জন্য নয়। তিনি ঠিক তাদের জন্য লেখেন না। লেখেন বুদ্ধিজীবী গোছের মানুষদের জন্য। উপন্যাসটি অত্যন্ত জটিল বাক্য, ব্যাপক বিষয়বস্তুসমৃদ্ধ ও সুগভীর সমাজ-অনুসন্ধানমূলক এক বৃহৎ উপন্যাস। বহু বিষয়ে পূর্ব-ধারণা ব্যতীত এ উপন্যাসের রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের এই আলোচনা পার্টির বিভিন্ন স্তরে ও ব্যাপক সাধারণ জনগণকে উপন্যাসটি পড়তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ততটা নয়। উপন্যাসটি পার্টি-নেতা ও মোটামুটি সচেতন বুদ্ধিজীবী কেডার এবং পার্টি-বহির্ভূত বামপন্থী তরুণ-বুদ্ধিজীবীদের পাঠ্য হতে পারে।

কিন্তু এ আলোচনাটি করতে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি এমন একটি অসাধারণ কাজ সম্পর্কে, এবং তার মত একজন অসম-সাহসী লেখক সম্পর্কে, যাকে 'নারী' বলে পৃথক করা উচিত না হলেও তার নারী-সত্তাটি নিপীড়িত ও বিপ্লবী নারীদের জন্য একটা গর্ব ও মর্যাদার বিষয় হতে পারে, তার সম্পর্কে আমাদের লোকদেরকে ধারণা দেয়ার জন্য; কারণ, সেটা সমাজ-সচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয়। আর সেটা আরো প্রয়োজনীয় একারণে যে, আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী ও জাতীয় শত্রু সম্প্রসারণবাদী ভারতের ঘনায়মান হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদের বর্বরতা ও দমনের মধ্যেও সচেতন সৎ ও মানব-দরদী একজন লেখক কী লিখছেন, আর আমাদের দেশের বেস্ট সেলার ও তরুণদের হার্টথ্রব উপন্যাস-লেখকরা কী লিখছেন সেটা বোঝার জন্য। যেটা মাওবাদী পার্টি হিসেবে আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এবং

এটাও দেখানোর জন্য যে, বাংলা সাহিত্যের বড় বড় রথী-মহারথীরা কোথায় পড়ে রয়েছেন, তাদের রবীন্দ্র-ভক্তি, আওয়ামী '৭১-চেতনা, ভারত-কংগ্রেসী তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতা, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মোহ, চপলমতি তারুণ্যের প্রেম, অশ্লীলতার কারণে এবং সর্বোপরি ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবর্গের মানুষের থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা ও শহুরে মধ্যবিত্ত এবং শাসকশ্রেণির করুণা-প্রার্থী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। অরুন্ধতী কমিউনিস্ট না হয়েও সেটা করেছেন অনেকটাই– তার সীমাবদ্ধতাসহ।

এইসব যদি ভূমিকা ও প্রাথমিক মূল্যায়ন হয়, তাহলে উপন্যাসটির গল্প ও বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে হবে পাঠককে বঞ্চিত না করার জন্য।

আসা যাক গল্পটিতে।

অরুন্ধতী উপন্যাসটি যেভাবে লিখেছেন তার রূপটিকে আধুনিক উপন্যাসের রূপ বলা হয়ে থাকে। বহু আগে, প্রায় ষাট বছর আগে, তুরস্কের বিখ্যাত কমিউনিস্ট কবি নাজিম হিকমতের লেখা তার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস "জীবন বড় সুন্দর"-কে পৃথিবী-খ্যাত লেখকরা বলেছিলেন তুরস্কের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। সেটাও সহজ ভাষার নিছক একটি গল্প নয়। কিন্তু এক অনুপম গল্পও সেটিতে রয়েছে। অরুন্ধতীর এ উপন্যাসটিও সেরকম। সেরকমই কিছু পরিমাণে আত্মজীবনীমূলক বা তার ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতার ছাপযুক্ত। তবে এ উপন্যাসটিতে আমরা একের মধ্যে অনেকগুলো পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পাবো, যেগুলোকে আবার একসূত্রে গ্রথীত করা হয়েছে, যাতে আসল বিষয়টি চলে এসেছে ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ ও বুর্জোয়া রাজনীতি, তার প্রতিপক্ষে এসেছে আজকের ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় মাওবাদী ও কাশ্মীর।

আধুনিক উপন্যাসে ঘটনাক্রম খুব জটিলভাবে গ্রথীত হয়। আগেরটা পরে, আর পরেরটি আগে। মধ্যে আবার বহু জটিল ঘটনাক্রম। জটিল সব বাক্য, শব্দ ও শব্দমালা, বিচিত্র তার গঠন-কাঠামো। সুতরাং পাঠককে প্রথমেই নয়, বা সহজেই নয়, খুব ধীরে ধীরে কাহিনীর মধ্যে সেটা টেনে নেবে। শুরুতেই আপনি তার গল্পটি বা তার সার বার্তাটি বুঝবেন না। যেমন কিনা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যযুগীয় মস্তিষ্ক-উপযোগী, তাদের কাছে বেস্টসেলার বটতলার উপন্যাস বকর সিদ্দিকীর 'ফুটন্ত গোলাপ', যেখানে শুরুতেই আপনি সমগ্র কাহিনীটি বুঝে ফেলেন; বা বাংলা সিনেমাগুলোতে যেমনটা ঘটে থাকে। অন্যদিকে অরুন্ধতীর এ উপন্যাসটিকে মনে হবে যেন কোনো গল্প নয়, অনেকগুলো সুগভীর, ব্যাঙ্গাত্মক, শ্লেষাত্মক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গ বদলে যাচ্ছে তার বিবরণীর মুনশিয়ানায়। কিন্তু সেগুলো পাঠককে পরিশ্রান্ত করবে না, সেগুলো রাজনৈতিক বিবৃতি নয়, বরং কাব্যেরও বেশি কিছু। প্রেম রয়েছে, যদিও নাজিমের উপন্যাসের মত অতটা প্রেমাক্রান্ত নয়। এটি অনেক বেশি রাজনৈতিক, যদিও একে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দেয়া কঠিন। যৌনতাও রয়েছে, যেখানে সমাজ মানুষের জীবন ও প্রেম রয়েছে

সেখানে সেটা থাকতে বাধ্য, কিন্তু তাতে জোর করে অশ্লীলতা নেই, শারীরিক মিলনের বিবরণ দেয়াটাই যেখানে মূখ্য, তুলনা করতে পারেন দেশের বিখ্যাত উপন্যাসিকদের কিছু অপন্যাসের সাথে। উপন্যাসটিতে প্রচুর স্ল্যাং ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠককে সেই শব্দগুলোকে যথার্থ মনে হবে, কারণ, অন্য কোনো 'ভদ্র'গোছের শব্দ সেখানকার ভাবটিকে প্রকাশ করতে পারতো না।

যাহোক, সেই জটিল প্রকৃতির কাহিনীটিকে বরং 'এক ছিল রাজা, আর এক ছিল রাণী....."– এই পুরনো ঢঙে বলা যাক খুব সংক্ষেপে, কারণ, সেই গল্প বলাটা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এমনকি পুস্তকটির কোনো পর্যালোচনাও এটা নয়। সেরকম করলে তার বহু জায়গা থেকে বেছে বেছে কিছু উদ্ধৃতি না দিলে তার গভীরতার কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু সেটা করার অর্থ হলো একটি ছোট-খাট উপন্যাস সাইজের পুস্তক লিখে ফেলা। যারা উপন্যাসটি পড়ার সময় পাবেন শুধু তারাই তার রসাস্বাদন (ও জ্ঞান) অর্জনে সক্ষম হবেন।

উপন্যাসটিতে যেমন নাজিম হিকমতের মতই একটি অনুপম গল্প রয়েছে, জীবন-কাহিনী ও প্রেম সবই রয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় করে রয়েছে তার আসল বক্তব্যটি, যা মোটেও প্রচারমূলক হয়নি, চমৎকার এক সাহিত্য সেটা, কিন্তু হাজারো প্রচারপত্রের বিষয়বস্তু সেখানে ঢুকে রয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে চলমান ভারতের সমাজ, তার বড় একটি অংশ, বিশেষত তার রাজনীতি, ক্ষমতা, অর্থনীতি, পরিবেশ, এবং সর্বোপরি চলমান ভারতের প্রধান রাজনৈতিক বিষয়– হিন্দুত্ববাদ, কাশ্মীর ও মাওবাদী রাজনীতি, যেগুলোর সবগুলোকে ভারত শুধু নয়, বিশ্বের প্রায় সকল উপন্যাসিকই এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন, হয়তো অনেকে তার খোঁজ নিতেও চান না, কারণ, সেগুলো তাদের জন্য অসুবিধাজনক, বা তারা তারই কোনো কোনো অংশ।

এখানে তাই গল্পটিও-নয়, তার একটা ধারণা মাত্র দেয়া যাক।

কাহিনীর ব্যাপ্তি ভারতের 'স্বাধীনতা' থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। শুরু হয় আনজুম নামের এক হিজড়ার জীবন নিয়ে। প্রথমে, কৈশোর পর্যন্ত, সে পুরুষ হিসেবে, আফতাব নামে, তার মুসলিম অভিজাত, কিন্তু তখনকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত এক পরিবারে, দিল্লির এক পুরনো ঘিঞ্চি এলাকায় বড় হয়। তার পরিবারকে তুলে ধরার সূত্রে দিল্লির মুসলিম ও বনেদী সমাজের বিবর্তন ও চিত্র অনেকটা উঠে আসে। কৈশোর পেরুনোর পর মাহতাবের হিজড়া পরিচয় তার মা আর গোপন রাখতে পারেননি। শুরু হয় টানাপোড়েন। শেষ পর্যন্ত সে নিজ পরিবার ছেড়ে চলে যায় বাড়ির কাছেই এক হিজড়া আবাসিক ভবনে– **খোয়াবগাহ** যার নাম। সেখান থেকে সে পুরোপুরি হিজড়া-সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। প্রায় ত্রিশ বছর সে ওখানেই থাকে। এভাবে আনজুমের জীবন-কাহিনীর

মধ্য দিয়ে আমরা চলে আসবো একেবারে বর্তমান ভারতের সূচনায়। যখন আনজুমের বয়স ৪৬।

উপন্যাসটির প্রথম এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এই আনজুমের কাহিনী– যার আড়ালে আমরা পাই গর্বিত ভারতের রাজধানী দিল্লির এক ক্লেদাক্ত রূপ। দেখা যায় বুর্জোয়া রাজনীতির ভন্ডামি, অন্তঃসারশূন্যতা, গণবিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের কর্পোরেটোক্র্যাসির উন্নয়ন এবং মুসলিম জীবনের ঝুঁকি ও অসহায়ত্ব, শিখ গণহত্যার ছোঁয়া, ভূপালে বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইড দ্বারা সৃষ্ট গণহত্যাসম কেমিক্যাল-দুর্ঘটনা, হিজড়া-চরিত্রের আড়ালে নারী-প্রশ্নে আধুনিক ভারতের বর্বর রূপ, এমন এক হিজড়ার মাতৃস্নেহ, ভারতের উন্নয়নের আড়ালে সমাজে পরিত্যক্ত শিশু– ইত্যাদি বহু কিছু। এবং শেষদিকে আসে গুজরাটের মুসলিম গণহত্যার সাথে ঘটনাচক্রে আনজুমের পরিচয়, যে গণহত্যার পেছনে মূল ভূমিকা ছিল ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী কুখ্যাত মোদির। লেখক সেটা সরাসরি বলতে ভয় পাননি।

আনজুমের মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও পরিত্যক্ত শিশু পালিত নেয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের সভ্য-শিক্ষিত মানুষের তুলনায় তার উচ্চ মানবিক গুণ প্রকাশিত হয়। আনজুম শিক্ষিত হতে পারেনি তার হিজড়া সত্ত্বা প্রকাশ হয়ে পড়ার পর থেকে। তার প্রেম হয়নি, যদিও হিজড়া সূত্রে তার যৌন-বন্ধুদের কেউ কেউ তাকে সত্যিই ভালবাসে, কেউ কেউ পরের জীবনেও। কিন্তু হিজড়া হয়ে গেলেও নিজ মায়ের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা, তার মুসলিম সঙ্গীত শিক্ষকের সাথে তার সম্পর্ক এসব মানবিক ও নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতি ও সম্পর্কগুলো টিকে থাকে। এভাবে হিন্দুত্ববাদের বিকাশের সাথে সাথে ভারতে মুসলিম জনগণ, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ ও নারী-প্রশ্ন, দিল্লির পরিবেশ ও রাজধানীর বুর্জোয়া রাজনীতির চাল-চরিত্র উঠে আসে।

আনজুমকে ঘিরে অবশ্যই আরো ছোট ছোট চরিত্র উঠে আসবে, যার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ সাদ্দাম, যে আসলে দলিত, চামার, হিন্দুত্ববাদের ছোবলে তার পিতা নিহত হয় মৃত গরুর চামড়া ছাড়ানোর কারণে, হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন, কারণ, থানার ওসি তাকে ও তার সঙ্গীকে রক্ষা করেনি, ঘুষ প্রদানে সমঝোতা না হবার জন্য। এ হত্যাকান্ডে পুলিশ, হিন্দুত্ববাদ, মিডিয়া– একাকার হয়ে যায়। সাদ্দামের আসল নাম দয়াচাঁদ। উক্ত মর্মান্তিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর সে শহরে পাড়ি জমায়, দলিত নাম বদলে ফেলে মুসলিম নাম ও পরিচয় নেয়– হয়ে যায় সাদ্দাম।

লেখক উপন্যাসটির সমস্ত পর্বে তো বটেই, বিশেষত এই প্রথম অংশে, নির্মমভাবে ও অতিসাহসের সাথে ভারতের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, দিল্লির মসনদে বসা কেজরিওয়াল, বিশেষত গান্ধীবাদী অহিংস নেতা এবং পরিশেষে বিজেপি নেতাদের নিয়ে ব্যাঙ্গ করেছেন, আর তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এক কার্টুন-তুলনীয় রসাত্মক বর্ণনায়। এনেছেন এনজিও এবং হিপহপ তরুণ সংস্কৃতির

সারহীনতাকে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে পরিত্যক্ত এক শিশুকে ঘিরে ঘটনা ও কাহিনী। এরকম এক শিশুকে আনজুম খোয়াবগাহে নিয়ে আসে পালিতা কন্যা হিসেবে– শিশুটি হিজড়া নয়। সে জয়নাব হয়ে বড় হতে থাকে। কিন্তু সমাজ এই শিশুটিকেই ফেলে দিয়েছিল, বোঝা চলে যে শিশুটি ছিল বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ শিশু, অথবা অন্য কোনো বঞ্চিত নারীর সন্তান, যিনি শিশুটির ভার আর সমাজে থেকে বহন করতে না পেরে, ভারতের মত এক নারী-শত্রু সমাজ ও রাষ্ট্রের তা বহন করার প্রশ্নই আসে না, এক দরগা'র সামনে তাকে ফেলে রেখে যায়। উদ্যোক্তারা কাউকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আনজুমকেই শিশুটির দায়িত্ব তুলে দেয়, সে-ই সেখানে শিশুটিকে প্রথম দেখেছিল।

এখানেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব-চরিত্রকেও আমরা পাই, আজাদ ভার্তিয়া, যিনি এক ধরনের মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রী, ত্যাগী, অন্যরকমের অনশনকারী, যিনি এসব পরিত্যক্ত শিশু, বা হতভাগাদের, নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনকারীদের (ভূপাল গণহত্যা– ইউনিয়ন কার্বাইড) এবং বিপ্লবী মাওবাদীদের একটা যোগাযোগকেন্দ্র হয়ে ওঠেন। তিনি অবস্থান করেন যন্তর মন্তরে, যা দিল্লির একটি পরিচিত কেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন ধারার আন্দোলনকারীরা নিজেদেরকে জমায়েত করে ও আন্দোলন প্রদর্শন করে।

পরের অধ্যায়ে তারই সূত্রে এখানে আরেক শিশুসহ আরেক নারীকে আমরা পাবো, তিলোত্তমা, যে এই উপন্যাসের আরেকটি কেন্দ্রীয় চরিত্র– পরবর্তী পর্বের কাহিনীতে।

আনজুম তার মধ্য বয়সে তার হিজড়া সৌন্দর্যের কাটতি কমে এলে, পালিতা কন্যা জয়নাবকে নিয়ে অন্য উঠতি সুন্দরী ইশরাতের সাথে দূরত্ব-জনিত মানসিক আঘাতের কারণে এবং বিশেষত গুজরাট ঘটনার সময় সেখানে তার প্রত্যক্ষ মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার পর থেকে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। সে প্রার্থিব সবকিছু বর্জন করে একসময় সম্পূর্ণ একাকী আশ্রয় নেয় এক পরিত্যক্ত কবরস্থানে।

আস্তে আস্তে সেখানে সে গড়ে তোলে এক আবাস, আড্ডাখানা, ঘর-বসতি– **জান্নাত গেস্ট হাউজ**– এবং ধর্ম-নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ-হিজড়া নির্বিশেষে সমতার ও ভালবাসার এক অনন্য জগৎ, বৃদ্ধ সঙ্গীত-শিক্ষকের মাধ্যমে এক সুর-জগৎ, যারা প্রচলিত সমাজকে কোনো শ্রদ্ধা বা মান্য করেনা। এবং তাদের দ্বারা বর্জিত ও ছুঁড়ে ফেলা। এরা এখানে পরিচয়-বিহীন বেওয়ারিশ লাশ সৎকার করে– যার কোনো অভাব গর্বিত ভারত-রাজধানীতে ছিল না। বঞ্চিত, সমাজচ্যুত, নিপীড়িত, কতকগুলো হাভাতে মানুষের এক মিলনক্ষেত্র– না নারী না পুরুষ, না মুসলিম না হিন্দু তারা– যাদেরকে আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারত ধারণ করেনি, স্রেফ ফেলে দিয়েছে, নিপীড়ন করেছে, শুধু দুঃখ আর কষ্ট দিয়েছে। তারা এখানে এক আনন্দ ভূবন গড়ে তোলে। হতে পারে এটাই উপন্যাসটির নামের উৎস– "পরমানন্দ", তাদের জন্য, যারা শুধু নিপীড়ন ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন চালিয়েছে। এখানে আনজুম, সাদ্দাম, সঙ্গীত

ওস্তাদ, আনজুমের কিছু প্রেমিক, আজাদ ভার্তিয়া এবং পরে ইশরাত, জয়নাব ও তিলোত্তমা– এদের নেতৃত্বে 'মন্ত্রণালয়'– "পরমানন্দ মন্ত্রণালয়"। এই জান্নাতকে কিছুটা অবাস্তব ও কাল্পনিক মনে হবে, যদিও সবটা নয়, তবে এরকম একটি পরমানন্দ-লয় তো আসলে কল্পনারই হতে পারে।

এই প্রথমাংশের পর কাহিনী চলে যায় আপাত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গল্পের মাঝে। সেটিতে আসবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাহিনী, যাদের সূত্র ধরে ভারতের বুর্জোয়া সমাজের কিছু পার্শ্বচরিত্র ও চিত্রকল্প– যাতে এক নারী– তিলোত্তমা– তাকে ঘিরে আরো তিনজন পুরুষ– বিপ্লব, নাগা ও মুসা– যারা তিলো'র বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধু, মধ্য '৮০-দশকে, যখন ভূপালের কেমিক্যাল গণহত্যা ঘটে, ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর শিখ গণহত্যা ঘটে। এরা তখন সবাই ছিল কম/বেশি বামপন্থী। এরা সবাই ছাত্রজীবনেই একতরফাভাবে তার প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু তিলোর সরাসরি কোনো সম্মতি বা অসম্মতি তারা পায়নি। সম্ভবত তার টানটা ছিল মুসারই দিকে। যে তিলোর মতই স্থপতি, সহপাঠী, সুদর্শন, কারণ সে কাশ্মীরি। তিলোর এই তিনবন্ধুরই ছিল পারিবারিক নব্য-বুর্জোয়া, শাসকশ্রেণির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু বিপরীতে তিলোর নিজের ছিল এক অস্বাভাবিক জীবনের ইতিহাস। সে ছিল অসুন্দরী না হলেও শ্যামলা বর্ণের যাতে ছিল তার অনাভিজাত্যের চিহ্ন। তার ছিল গভীর এক বিষাদ, এক বিচ্ছিন্নতা, এক আত্মপ্রতিষ্ঠা-বিমুখ মনন, যার জীবন-কাহিনীটা উঠে আসবে আরো পরে। এটাই হয়তো কারণ যে, কেন সে তিন বন্ধুর কারো সাথেই তখন বিয়েতে বাধা পড়েনি, অথবা তার ব্যক্তিগত জীবন সূত্রে বিয়ে বিষয়টিতেই তার ছিল অনীহা। হয়তো সে সেটি ঘৃণাও করতো। কিন্তু তিন বন্ধুর প্রতিই তার টান ছিল। সম্পূর্ণ কাহিনীটা পড়ার পর এটিকে এই তিন বন্ধুর সাথে এক ত্রিমুখী প্রেমের এক কাহিনীও বলা যেতে পারে, যার কোনোটাই শেষপর্যন্ত জোড়া লাগে না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের এক বিষাদাক্রান্ত কাহিনি, কিন্তু যা শেষ পর্বে এসে পরিণতি পায় ছন্নছাড়াদের জান্নাত গেস্ট হাউজের পরমানন্দে।

প্রথমে আসছে সেই তিন বন্ধুর সাথে তিলোত্তমার বিশ্ববিদ্যালয়-কালীন বন্ধুত্ব। যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, পরবর্তীতে তাদের দু'জন– বিপ্লব ও নাগার – প্রথম জীবনের পেশাগত জীবন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভারতীয়করণ, ভারতের রাষ্ট্রশক্তির অংশে পরিণত হওয়া। ক্রমে ক্রমে তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড। এবং তৃতীয় জনের, তিলোর আসল প্রেমানুভূতি ছিল যার সাথে, মুসা, তার কাশ্মীরি জাতিসত্তার কারণে এই ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ থেকে তার ছিটকে পড়া ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়া। এগুলো একে একে উঠতে থাকে। আর এরই সূত্রে তিলো'র জীবনের কাহিনীও আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে।

কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আসলে বিবৃত হতে থাকে ভারতে মুসলিম নিপীড়নের ও একইসাথে একটি স্বাধীনতাকামী জাতির উপর বর্বরতার এক নির্মম চিত্র-রূপ হিসেবে

কাশ্মীর-কাহিনি। আসলে এটাই রাজনৈতিকভাবে উপন্যাসটির প্রধান বিষয়। হয়তো সরাসরি কাশ্মীরের ভিতর লেখক ঢুকতে চাননি; হতে পারে নিরাপত্তাগত কারণে, অথবা এটাই তার উপন্যাসের স্বকীয়তা। দেখা যাবে যে, নাগা ও বিপ্লবকে আনলেও মূখ্য হয়ে ওঠে কাশ্মীরি মুসা এবং কাশ্মীর– সেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্বরতম নিপীড়ন, জনগণের জীবন-পরিস্থিতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশ, ভারত ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও জটিল অবস্থা– ইত্যাদি বহু কিছু রয়েছে অপূর্ব দক্ষতায়, মমতায় ও সত্যানুসন্ধানী এক সাহসী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পর তিলো স্থপতির উচ্চ জীবনে স্থিত হয়নি। তখনো ততটা প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সাংবাদিক নাগা তার সাথে প্রেম করতে চাইলেও তিলো তাতে সাড়া দেয়নি। সেটা পরে বর্ণিত হয়, আগে আসে বিপ্লবের জবানিতে উপন্যাস-কাহিনীর এই দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বড় অংশটি।

বিপ্লব– বিপ্লব দাস গুপ্ত– পেশাগতভাবে হয়ে ওঠে শাসকশ্রেণিরই এক প্রতিনিধি, বিশেষত কাশ্মীরে ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নের হাতিয়ার গোয়েন্দা অফিসারদের একজন। সে বিয়ে করে, সংসার হয়, কিছু পরে সেটা বিচ্ছেদে রূপ নেয়। ইত্যাদি। তার জবানীতে উঠে আসে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে কাশ্মীর নিয়ে শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের চরম নিপীড়ক বুর্জোয়া অবস্থান। একইসাথে এই শাসকশ্রেণির এক কদর্য রূপ। কিন্তু তার মাঝে তিলোর জন্য এক ধরনের অনুভূতি সর্বদাই ক্রিয়া করে। সে স্ত্রী-বিচ্ছেদ ও মধ্য-বয়সে এক ফ্ল্যাট ভবনের মালিক হয়ে একা থাকে। কিন্তু পরে সেখানে তিলোর আগমন, এক পথে-পাওয়া শিশুকে নিয়ে তিলোর চলে যাওয়া, পুলিশের খোঁজ নেয়ার খবর ও তিলোর রেখে যাওয়া কাগজপত্র থেকে মুসার বহু কাহিনি জানার মধ্য দিয়ে সে এক বিধ্বস্ত মানুষে পরিণত হয়, হয়তো সেটা ভারতীয় আমলাদের পরিণতি হিসেবে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, রূপক ভাবে। অবশ্য এগুলো কাহিনির অনেক পরের বিষয়।

নাগার পরিবার উচ্চ-আমলা। সে সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া মিডিয়ার এক বড় কর্ণধার হয়, যার সাথে রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা নাগার পরিবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণই ছিল। কিন্তু সেই নাগা এক পর্যায়ে তিলোকে বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু সেটা হঠাৎ করেই নয়। আগে মুসা-সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনির অর্ধেকটা আসার সূত্র ধরে। কারণ, মুসা যদিও কাশ্মীরি রাজনীতিতে যুক্ত ছিল না, সে বিয়ে করেছিল, তার স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভালবাসতো, জেবিন নামের একটি কন্যা-সন্তান তাদের হয়েছিল, তার পরিবারও ছিল এক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত উচ্চ ঠিকাদার, কিন্তু মুসা ততটা উচ্চকাঙ্ক্ষী বা প্রতিষ্ঠাকামী হয়ে ওঠেনি। ঘটনাচক্রে মুসা কাশ্মীরি জঙ্গি হয়ে যায়, যা সে হতে চায়নি। তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, উদারনৈতিক মানবিক কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদী, যেটা হয়তো অনেকটা লেখকেরই

দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু কাশ্মীর তাকে ঠেলে দেয় অনিশ্চিত জীবনে, হয়তো মুসলিম জঙ্গিত্বের মিশ্রণের দিকে, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

কাশ্মীরে যখন যেকোনো প্রতিবাদকে গুলি ও গুমের মাধ্যমে জবাব দেয়ার পথ নিয়েছিল রাষ্ট্র, সে রকমেরই এক দিনে সেরকম এক মিছিলের দৃশ্য দেখতে যখন মুসার স্ত্রী তার কন্যাকে নিয়ে তাদের বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল তখন তারা গুলিবিদ্ধ হয় এবং নিহত হয়। মুসা নিথর হয়ে পড়ে। সে বাহ্যত কোনো হাহাকার করেনি, চিৎকার-চেঁচামেচি-কান্নাকাটি-আহাজারি করেনি– আর সেটাই তার বিপদ ডেকে আনে। কেন একজন অবস্থাপন্ন যুবক স্ত্রী-কন্যা হারিয়েও এমন নিথর-নিশ্চুপ থাকতে পারে! নিশ্চয়ই সে জঙ্গি-দলে যুক্ত!

এভাবে কাশ্মীর উপন্যাসটির কেন্দ্রে চলে আসে। এবং সেই সূত্রে আসে কাশ্মীর-নিপীড়নের ও জঙ্গি আন্দোলনের বাস্তবতার সূত্র ধরে গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র অমরিক সিং। যাকে এক ক্ষুদে হিটলার ও নিপীড়নের এক স্থূল যন্ত্র বলা যেতে পারে।

অমরিক সিং মুসার পরিবারে তার বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই সূত্রে মুসা হয়তো স্ত্রী-কন্যা হারানোর পর তার 'অস্বাভাবিক' আচরণের কারণে পুলিশী-গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদের চক্কর পেরিয়েও জীবন পেয়ে যায়– যা কাশ্মীরে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু স্ত্রী-কন্যা হারা স্বচ্ছল উদভ্রান্ত এই যুবকের জীবনে উভয়-সংকট নেমে আসে। কারণ, তাকে আটক করেও কোনো নির্যাতন না করে ছেড়ে দেয়া যেমন কাশ্মীর-পরিস্থিতিতে তাকে জঙ্গিদের টার্গেট করতে পারে। তেমনি সে অমরিকের প্রস্তাব–নির্দেশ– মতো তাকে যদি সহায়তা না করে তাহলে অমরিক তাকে টার্গেট করবে এবং তাকে মরতে হবে।

ফলে মুসা ঘর ছাড়ে, নতুন জীবনে চলে যায়, তিলো তার কোনো খবর আর সংগ্রহ করতে না পেরে কাশ্মীর যায়। এখান থেকে কাহিনি নতুন মোড় নেয়। কিন্তু তার আগেই লেখকের অনুপম সাহিত্যিক বিবরণীতে কাশ্মীরে জঙ্গিদের সংগ্রাম, তার বিভক্তি, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও হিটলারি কৌশল ইত্যাদি যতটা সম্ভব এসে গেছে।

মুসা কাশ্মীরে তার গোপনজীবনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিলোর খবর জানতে পেরে তার সাথে সংযোগ করে, পরে গোপনে সাক্ষাত করে, যা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে গুলরেজ নামের এক অধীনস্ত সহকর্মীর মাধ্যমে তারা বিয়ে করে–বিয়ের প্রয়োজন হয়তো ছিল না, কিন্তু কাশ্মীরের ধর্মীয় মৌলবাদী আবহের কারণে যেটা তিলো মেনে নেয়। এবং তারা কয়েকদিন একত্র থাকে, রাত্রিযাপন করে, একটি লঞ্চের মতো জলযানে, সঙ্গী গুলরেজের সৌজন্যে। মুসা নিজেও গুলরেজ-কমান্ডার নামে পরিচিত ছিল, এবং সরকারি নথিপত্রে সে ছিল খুবই ওয়ান্টেড এক নেতা– যার পেছনে অবশ্যই অমরিক সিং-এর ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু মুসা বেশিদিন তিলোর সাথে থাকতে সক্ষম ছিল না, কারণ, সে তখন গোয়েন্দা-খাতায় হাইলি ওয়ান্টেড মৌলবাদী সন্ত্রাসী গুলরেজ-কমান্ডার নামে পরিচিত। প্রেমঘন সময়কে সংক্ষিপ্ত করে মুসা বিদায় নেয়। কিন্তু তার বিদায় নেয়ার কিছু পরই অমরিক সিং-এর নেতৃত্বে জলযানটি সেনাবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়, তিলো এবং গুলরেজ গ্রেফতার হয়, গুলরেজকে কিছু পরেই হত্যা করা হয়, লাশটি বস্তায় ভরে তারা সাথে নেয় পরে ভয়ংকর 'কমান্ডার গুলরেজ'-এর সাথে এক বন্দুকযুদ্ধের কাহিনি প্রচার ও তার দ্বারা নিজের কৃতিত্ব জাহির ও পুরস্কার বাগিয়ে নেয়ার জন্য।

তিলোকে গ্রেফতার করা হয়, তার পরিচয় জানার চেষ্টায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় টর্চার-সেন্টারে। শুধু তিলোই জানতো যে, এই গুলরেজ মুসা নয়, প্রকৃত গুলরেজ-কমান্ডার, অর্থাৎ মুসা পালিয়ে গেছে। তিলো মুখ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেটা নিপীড়ন ও হত্যা-গুমকে এড়িয়ে সম্ভব ছিল না। জেরার এক মুহূর্তে সে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধু বিপ্লবের সাহায্য নিতে মনস্থ করে, যে তখন কাশ্মীরে এক উচ্চ গোয়েন্দা কর্মকর্তা, এবং ঠিক সে সময়টায় শীর্ষ পর্যায়ের এক সেনা-নেতার সাথে ভ্রমণরত। তিলো শুধু অমরিকের জেরার মুখে একটি কোড লিখে বিপ্লবকে পাঠাতে বলে, বিপ্লবের তখনকার অবস্থান ও পদবি তার জানা ছিল। এই কোডটির মাধ্যমে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়, শুধু বিপ্লব, নাগা ও মুসাই সেটা জানতো, যা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এক স্মৃতির সাথে যুক্ত।

বিপ্লবের পদবি অমরিক সিং-এর উপরে বিধায় অমরিক সতর্ক হয়ে পড়ে, বিপ্লবকে ফোন করে এবং কোডটা জানায়। বিপ্লব সাথে সাথে বুঝতে পারে যে, গুলরেজের সাথে বন্দি বিধায় তিলো জীবন-মৃত্যুর মুখে। তাকে বাঁচাতে হবে। যাকে সে এক সময় পছন্দ করতো ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নেয় তিলোর খবরটি যাতে প্রচার না হয় এবং তিলোর জীবন যেন রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করার। কিন্তু তার পক্ষে তখনই তার সেনা-প্রধানের সঙ্গিত্বের দায়িত্ব থেকে স্থান ত্যাগ সম্ভব ছিল না। তাই, সে অমরিকের থেকে তার করণীয় ঠিক করার জন্য কিছুটা সময় নেয়, তখন কাশ্মীরে কর্মরত তার শাসকশ্রেণির-হয়ে-পড়া সাংবাদিক বন্ধু, এবং তিলোরও, নাগাকে ফোন করে এবং কিছু পরেই অমরিককে জানায় যে, নাগা নামের সাংবাদিক যিনি এখন অমুক, তিনি রাতের মধ্যেই অমরিকের ওখানে যাবে, এবং তিলোকে যেন নাগার হাতে তুলে দেয়া হয়।

অমরিক সাথে সাথেই তিলোকে জেরা বন্ধ করার নির্দেশ দেয় এবং নাগার অপেক্ষায় থাকে। তিলোকে রক্ষায় নাগা বহু প্রতিকূলতাকে পাড়ি দিয়ে ঠিক সময়েই কেন্দ্রে পৌঁছে এবং বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে তিলোকে উদ্ধার করে নিরাপদে চলে আসে।

এরপরই তিলোর জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আগে সে নাগার উৎসাহ সত্ত্বেও তাতে সাড়া দেয়নি, মুসাকেই সে ভালবাসতো, এবং কাশ্মীরে গিয়ে বিয়েও

করেছিল, কিন্তু এখন সে যদিও প্রথমে নাগার আগ্রহে তাকে বিয়ে করতে দ্বিমত জানায়, কিন্তু পরে বেশ কিছু কারিকার মিশ্রণে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে নাগাকে বিয়ে করবে। যার মধ্যে প্রধানতম বিষয় ছিল কাশ্মীরি বর্বরতার হাত থেকে তার আত্মরক্ষা, কারণ, কাশ্মীর সফর ও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে সক্ষম ছিল যে, তার একটি নিরাপদ জায়গা দরকার আত্মরক্ষা ও একইসাথে এই ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। আর নাগার পারিবারিক ও তৎকালীন পেশাগত জীবনের চেয়ে ভাল আত্মরক্ষার বর্ম তার জন্য আর কিছু তখন হতে পারতো না।

কিন্তু ততদিনে একদিকে নাগা তার প্রাক্তন ছাত্র-জীবনের জঙ্গি বামপন্থী চেতনার সবটুকু খুইয়ে ফেলেছে এবং নিজে শাসকশ্রেণির মধ্যে সেঁধিয়ে পড়েছে। তবে সে একটা বিয়ে করেছিল, তাদের শ্রেণিগত, কিন্তু যা এক বছরের বেশি টিকেনি। ফলে তখনো সে তিলোকে চায় এবং তিলোকে সম্মানও করে।

অন্যদিকে তিলো নাগার আশ্রয়ে আসার অল্প পরেই বুঝতে পারে যে, সে অন্তসত্ত্বা– আর সেটা যে মুসার শিশু সেটা তার চেয়ে আর কে ভাল জানতো। মুসা তাকে প্রতারণা করেনি, কিন্তু ঐ কদিনেই সে জানতে পেরেছিল মুসার অস্তিত্বে তার কন্যা জেবিনের স্থান কতটা বড়। অন্যদিকে মুসা জীবিত জানলেও তিলো মুসার অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে ইতিমধ্যে বুঝে গেছে। সে নিজেও নাগার জীবনে জুড়ে গেছে। সবমিলিয়ে সে বাচ্চাটি নস্ট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে এটা গোপন করে, বাচ্চাটি নস্ট করে এক কঠিন অবস্থায় এবং নাগাকে জীবনের সাথে জুড়ে দেয়– তা না ছিল ভালবাসার, না ছিল ভালবাসা-হীনতার। আসলে সেটা ছিল এক উৎসাহহীন লটকে থাকার জীবন। সন্তান নস্ট করতে বাধ্য হওয়া এবং নাগার সাথে এক অর্থহীন ভবিষ্যতহীন জীবন তার মনে এক গভীর বিষাদ এনে দিয়েছিল, যাকে আরো তীব্র করে তোলে মায়ের মৃত্যুকালে তার উপস্থিতি এবং মায়ের জীবনের করুণ কাহিনী দ্বারা তার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি, যা আরো পরে আসবে। নাগার সাথে সে সন্তান না-নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নাগার পরিবার শুরু থেকেই তাদের শ্রেণিগত কারণেই তিলোকে গ্রহণ করেনি। এভাবে ১৪ বছর পার হলো। তিলো মধ্য-বয়সে পড়লো। তখন ২০১০ সাল। এই টানাপোড়েনে তিলো এক ধরনের মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত হয়ে গেছে বলেই নাগা ভাবতে থাকে।

এ দীর্ঘ সময়ে তিলো মুসারও কোনো খোঁজ আর পায়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এ জীবনে হাঁফিয়ে ওঠার ফলে তিলো পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। পত্রিকা/অনলাইনে বিজ্ঞাপনের সূত্রে সে একটি নতুন বাসায় উঠে যায়, প্রথমদিকে অস্থায়ীভাবে, নাগার বাসায় থেকেই, পরে স্থায়ীভাবে, নাগাকে কার্যত সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, যেটি আসলে ছিল বিপ্লবের নিজ বাসা, তখন সে সেই ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছিল। বাসায় যাবার পর উভয়ে বুঝতে পারে যে, কে কার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে।

এই ফ্ল্যাটে প্রায় চার বছর পর হঠাৎ করেই মুসার আবির্ভাব ঘটে– তিলোর সাথে প্রথম বিচ্ছেদের প্রায় ১৮ বছর পর। সে কাশ্মীরে ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ থেকে

বাঁচাতে নিজ সঞ্চিত কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র-ছবি-ডাইরি ইত্যাদি তিলোর ঘরে রেখে যায়, এবং আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

এসব কাগজপত্র থেকে তিলো মুসাকে নতুন করে আবিষ্কার করে, নতুন করে তাকে ভালবাসে, নতুন করে কাশ্মীরকে বুঝতে পারে, নতুন করে তার সন্তান আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে, মুসার কন্যা জেবিনকে সে আপন ভাবতে থাকে।

এটাই একটা বড় কারণ যে, যদিও তখন বিপ্লবের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে, এবং বিপ্লব হয়তো তখনো তিলোকে পছন্দ করে, এবং বিপ্লবের সহৃদয় আশ্রয়ের কারণে তাকে তিলো বিয়ে করতে পারতো, কিন্তু মুসার কাগজ-পত্র থেকে তিলো মুসার ভুবনেই আবারও চলে যায়। বিপ্লবের সাথে তিলোর কোনো সম্পর্ক আর গড়ে উঠতে পারে না। অবশ্য এক্ষেত্রে তিলোর জন্মকাহিনী, পারিবারিক পরিচয়, মায়ের মৃত্যু ও মৃত্যুকালে তার সাথে তিলোর বেদনাময় স্মৃতিও তিলোর মননকে ইতিমধ্যে বদলে দিয়েছিল।

এর আগেই আমরা তিলোর মায়ের কাহিনী জেনে গেছি, যখন তিলো নাগার কাছে তখনই তিলোর মা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিলো মায়ের কাছে যায়। মায়ের প্রতি তার এক ধরনের বিতৃষ্ণা কাজ করতো, তার নিজের জীবনের পরিচয়হীনতার জন্য সে তার মাকেই দায়ী করতো। কারণ, যদিও তার মা বলতো যে তাকে সে পালক নিয়েছিল, কিন্তু মানুষ বলতো যে তিলো ছিল তার মা মরিয়েমের এক নিম্ন-বর্গের পুরুষের সাথে বিবাহ-পূর্ব প্রেমের ফসল। ধর্ম-সমাজ ইত্যাদি কারণে সে তার জন্মের পরই শিশু-আশ্রমে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তাকেই আবার সে পালিতা কন্যা হিসেবে বড় করেছিল। এভাবে তিলোর নিজের কাহিনীটাও উঠে আসে। যা তাকে এইসব বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত থেকেও সর্বদা তাকে এক বিচ্ছিন্ন ও বিষাদাক্রান্ত জগতে নিয়ে যেতো। যে মায়ের কথা কখনো সে কাউকে বলেনি। তিলোর মায়ের মধ্য দিয়ে অরুন্ধতীর নিজ মায়ের জীবন এবং তিলোর স্থপতি জীবনের মধ্য দিয়ে নিজ জীবনের কিছু সত্য হয়তো লেখক বলতে চেয়েছেন।

মায়ের মৃত্যুর সময়কালে তিলোর জীবনের বহুকিছু তার কাছে নতুন করে ধরা দেয়। আর এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা আবারো পাই ভারতের মতো এক গণতান্ত্রিক সভ্য দেশে নারীদের উপর নিপীড়ন ও ধর্মীয় পায়ের বেড়ি, অস্পৃশ্যতা, কতটা শক্তিশালী। তিলো বড় হয়েছিল এই মায়ের কাছে একজন পিতৃপরিচয়হীন সন্তান হিসেবে। তার মা-ও একই কারণে তাকে নিজ সন্তান পরিচয় না দিয়ে পালিতা কন্যা হিসেবে পরিচয় দিতেন। এক সিরীয় বংশোদ্ভূত খ্রিষ্টান নারী, কেরালায় শিক্ষকতা করেন এবং খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু সমাজ তাকে মেনে নেয়নি, এমনকি তার মৃত্যুর পর তার তথাকথিত অবৈধ সন্তান জন্মের কারণে তার সৎকার করতেও অস্বীকার করে। দুটো অবৈধ শিশুর কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনী যেভাবে বারবার মোচড় খেয়েছে, সেটা তিলোর নিজ জন্মের ও ব্যক্তি-ইতিহাসের ঘটনাগুলোর সাথেও এখন মিলে যাচ্ছে।

যাহোক, কিছুদিন পর বিপ্লবের বাসায় একটি শিশুর আগমন তিলোর জীবনকে আবারও বদলে দেয়। অজয় ভার্তিয়ার কাছে তিলো প্রায়ই যেত, তার অন্তরের শান্তির জন্য, কারণ, মায়ের মৃত্যু-সময়কালের স্মৃতি ও মুসার কাগজপত্রের কাহিনীর প্রভাবে সে অন্য কোথাও স্থিত হতে পারছিল না। সেই সূত্র ধরে সে অনশন-ক্ষেত্রে গিয়েছিল, গিয়ে শিশুটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে এবং পুলিশী হট্টগোলের সুযোগে সে সবার অজান্তে শিশুটিকে নিজ ঘরে নিয়ে আসে। প্রথম সন্তানটিকে গর্ভাবস্থায় নস্ট করার কারণে তার সন্তান-আকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যে আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিত্যক্ত হলেও পুলিশ সে শিশুটির সন্ধানে তিলোর ফ্ল্যাটটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়, আজাদ ভার্তিয়ার কাছে দুনিয়ার কাগজপত্রের মাঝে রক্ষিত তিলোর নাম-ঠিকানাটিও ছিল; তারই রেশ ধরে। পুলিশ বাড়ির অন্য ভাড়াটিয়ার কাছে শিশুটির খোঁজ নেয়, তারা প্রাপ্ত ঠিকানাগুলোতে খোঁজ নিচ্ছিল। সেটা জেনে নিজ ও শিশুটির নিরাপত্তার জন্য তিলো অস্থির হয়ে পড়ে। আবারও আজাদ ভার্তিয়াই তাকে উদ্ধার করে, যার সাথে আনজুম-সাদ্দামের এবং জান্নাত গেস্ট হাউজেরও যোগাযোগ ছিল।

তাদের মাধ্যমেই তিলো শেষপর্যন্ত জান্নাত হাউজে স্থান নেয়। এক পরমানন্দের জগতে সে তার শিশুকে নিয়ে আশ্রয় পায় ও আশ্রয় নেয়, যার নিজ জীবন, মায়ের স্মৃতি, মুসার সাথে তার প্রেম, নাগার সাথে তার এক ধরনের জীবন ও বিপ্লবের সাহায্য সত্ত্বেও এই সমাজে তার যাপিত জীবন ও সেই সমাজ থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল; জীবন ও সমাজ থেকে আর কিছু চাইবার তার ছিলনা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার পুলিশের থেকে নিজের ও শিশুটির জীবনকে রক্ষা করার জন্য। সে এক নতুন অবৈধ গোপন জীবনে নিজেকে নিয়ে যায়। যেখানে জয়নাব-সাদ্দামের বিয়ে হচ্ছে, তিলোর সন্তানটি বড় হচ্ছে তার দেয়া নাম 'জেবিন' নামে– যার পরিচয় কেউ জানে না, মুসার নিহত কন্যার স্মরণে তার দেয়া এই নাম মুসা ও তার জীবন ও সংগ্রামের প্রতি তিলোর দুর্বলতা ও প্রেমকেই প্রকাশ করে। তবে এর মধ্য দিয়ে লেখক নতুন ভারতের নতুন নাগরিকদের জীবনের সূচনাকে হয়তো তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিলোর কাহিনীর শেষ এখানেই।

কিন্তু এই অপরিচিত শিশুটির ইতিহাস নিয়ে উপন্যাসের তৃতীয়, সংক্ষিপ্ত ও শেষ পর্বে যে তথ্যগুলো কাহিনী আকারে উঠে আসে, তাতে পুরো উপন্যাসটি তার শেষ ও স্বল্প পরিসরের এই অংশে মাওবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করে। আবারও আজাদ ভার্তিয়ার সূত্রে শিশুটির পরিচয় পাওয়া যায়। সে হলো এক মাওবাদী দলিত নারীর শিশু। শিশুর মা তার পরিচয়টি তার শহীদ হবার পর প্রকাশ করার অনুরোধ করেছিল এক চিঠিতে, কারণ সে জানতো মাওবাদী গেরিলা জীবনে তার পরিণতি শহীদ হওয়া। সুতরাং যখন এক আবেগঘন পরিবেশে সকলের সামনে আজাদ চিঠিটি পড়ছেন, তখন শিশুর মা মাওবাদী রেবতী নিহত হয়েছেন।

চিঠিতে রেবতী ও তার মতো অন্যরা কেন ও কীভাবে মাওবাদী আন্দোলনে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। লিখেছেন তাদের উপর রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও শাসকশ্রেণির গুণ্ডাদের, বর্ণপ্রথার অভিশাপের মর্মান্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। শিশুটির পিতা কে এই মা তা জানতো না, কারণ, এটি তার গর্ভে এসেছিল যখন সে পুলিশী হেফাজতে তাদের বেশ কয়েকজনের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল। জন্মের পর সে শিশুটিকে হত্যা করতেই চেয়েছিল। কিন্তু তার মাতৃ-স্নেহ রেবতীকে বিরত করে। কিন্তু মাওবাদী গেরিলা যুদ্ধে শিশুসহ কেউ থাকতে সক্ষম নন। অগেরিলা কার্যক্রম তার শেষ হয়ে এসেছিল, এবং তাকে গেরিলা অঞ্চলে ফেরত যেতে হবে। এ অবস্থায় শিশুটিকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না। সে শহরে যন্তর মন্তরে শিশুটিকে ফেলে চলে যায়, আজাদ ভার্তিয়া সেটা লক্ষ করে। তারপরে শিশুটি কীভাবে তিলোর অধিকারে এলো, এবং পরে তিলোর সাথে জান্নাত গেস্ট হাউজে– সেটা আগেই বলা হয়েছে।

জান্নাত গেস্টহাউজের 'পলিটব্যুরো' সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের কায়দায় তারা রেবতীকে কবর দেবে– তার অনুপস্থিতিতে– তার চিঠিটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায়, কমিউনিস্ট পতাকা মুড়িয়ে, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গেয়ে, আজাদ ভার্তিয়ার পরামর্শে ও নেতৃত্বে। আর সিদ্ধান্ত নেয়, এই মাওবাদী দলিত নিপীড়িত বিপ্লবী নারীর প্রতি শ্রদ্ধার্থে তার দেয়া কন্যার নাম 'উদয়া'র সাথে যুক্ত করে তিলোর পালিতা কন্যা জেবিনের নাম রাখা হবে এখন থেকে 'উদয়া জেবিন' (মাওবাদী ও স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরি যুক্তফ্রন্ট?!)। আরো সিদ্ধান্ত হয়, শিশুটি বড় হলে তাকে তার মায়ের সব কথাই বলা হবে, কিন্তু বাবার কথা মোটেই নয় (তারা ধর্ষক পুলিশ/রাষ্ট্র)। মনে রাখতে হবে যে, জেবিন ছিল তিলোর প্রেমাস্পদ মুসার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তার কন্যার নাম, যাকে 'দুর্ঘটনা'বশত হত্যা করেছিল কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

হতে পারে, এই মোহনায় হয়তো মিলে গেছে ভারতীয় রাষ্ট্রে ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিপ্লবী মাওবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী কাশ্মীরি, একজন হিজড়া যাকে এই সমাজ কখনো ধারণ করেনা ও দুটো শিশু যাদের মধ্য দিয়ে এসেছে নিপীড়িত নারী-সমাজ, একজন দলিত– সাদ্দাম এবং একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তিলো, যার জন্ম হতে পারে অবৈধ, এবং যে এই সমাজে থাকতে না পেরে, সুখী হতে না পেরে পরমানন্দের জান্নাতে হাজির হয়েছে বাসিন্দা হতে– স্থায়ীভাবে। এটাই হয়তো লেখকের স্বপ্ন, এটাই হয়তো লেখক উপন্যাসটিতে দেখাতে চেয়েছেন। অথবা অন্য আরো কিছু।

সমাপ্তিতে লেখক মুসাকে আবার এনেছিলেন বিপ্লবের বাড়িতে রেখে যাওয়া কাগজপত্রগুলো নিয়ে যেতে, কিন্তু এসে সে জানতে পারে যে, এই বাড়ি শাসকশ্রেণির বিশ্বস্ত চাকর হয়ে পড়া তার সেই প্রাক্তন বন্ধু বিপ্লবের, এবং তিলো সেখান থেকে চলে গেছে, কোথায়, তা কেউ জানে না। এসময় মুসা-বিপ্লবের সংলাপের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের এক বিধ্বস্ত চেহারা বেরিয়ে আসে, কিন্তু সে তার শ্রেণি ও রাষ্ট্রকেই

প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্য দিয়ে লেখক ভারত-সমাজের এক অনিবার্য ভঙ্গুর চিত্র দেখাতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির চমৎকার সমাপ্তি বলা চলে। অবশ্য আমরা কিছু পরেই আবার পাবো মুসার অতি-মানবিক শক্তির পরিচয়, যখন সে জান্নাত গেস্ট হাউজে উপস্থিত হয়, তিলোর সাথে কয়েকদিন যাপন করে, এবং আবারো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, নিশ্চিতভাবেই তার কাশ্মীরে।

এক গোপন জীবনে এইসব বিপ্লবী সমাজ-পরিবর্তনকামী, নারী ও যৌন-প্রশ্নে নিপীড়িত ও বঞ্চিত নারী, পরিত্যক্ত শিশু, দলিত– কাকে নয়। সেখানে চলছে এক পরমানন্দের জগৎ, যাকে চালায় এক বিজ্ঞ গণতান্ত্রিক মন্ত্রণালয়। একটা অসাধারণ উপন্যাস ও এক রাজনৈতিক সমাধান!

** লেখক মাওবাদী বা কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে কিছুটা বিভ্রান্ত সেটা বোঝা যাবে একাধিক জায়গায়– অন্তত তিনটি জায়গায় স্ট্যালিনের 'গুলাগ অত্যাচারে'র বিষয়টিকে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে (পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের মতই)। উপরন্তু পাঠক রেবতীর চিঠির সেই অংশ থেকেও বিভ্রান্ত হতে পারেন যে, স্ট্যালিন, মাও– তারা অনেক ভুল করেছেন (নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু বুর্জোয়া মানবাতাবাদীরা যেভাবে সেগুলোকে দেখে, সেভাবে বর্ণনা শুধু শ্রেণিসংগ্রামের তিক্ততা না বোঝার উদারনৈতিক মানসিকতার থেকেই উদ্ভূত।) এবং আরো যা মারাত্মক সেটা হলো যে, পাঠককে একটা ভুল বার্তা দিতে পারে এই পত্রের কিছু অংশ, যাতে ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে যে, এসব দলিত আদিবাসী নিপীড়িত নারীদের মাওবাদী আন্দোলনের এমন সব ত্রুটি সত্ত্বেও সেখানে যোগ দেয়া বা থেকে যাওয়া, এবং শেষ পরিণতি হিসেবে শত্রুর হাতে শহীদ হওয়া ব্যতীত আর কোনো পথ নেই। এটা যে একটা সচেতন প্রক্রিয়া, একটা বিজ্ঞান-সম্মত আন্দোলন যার বিজয়ী সমাপ্তি শুধু কাম্য নয় অনিবার্য, এটা-যে এক গুরুতর সচেতন বিপ্লবী সংগ্রাম, কিন্তু একইসাথে যা একটি ব্যাপক গণমুখীতা সম্পন্ন এক বিশাল আন্দোলন হওয়ায় তাতে একটা কম সচেতন অংশ নিশ্চয়ই রয়েছে, তাদের মনে বাধ্যবাধকতার টানাপোড়েন রয়েছে, কিন্তু সেটা দ্বারা এর সচেতন অংশগ্রহণ ও বিপ্লবী চেতনাকে ছায়াচ্ছন্ন করা যায় না।

একইসাথে লেখকের ইতিবাচক বর্ণনা সত্ত্বেও মাওবাদী আন্দোলনের এক ভবিষ্যতহীনতার বার্তা যেন পত্রটির মধ্য দিয়ে ঠেলে উঠতে চেয়েছে, যা বহু বুর্জোয়া সমাজ-গবেষক ও এমনকি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ইতিবাচক বুদ্ধিজীবীদেরও দৃষ্টিভঙ্গি। তুলনায় কাশ্মীরি আন্দোলনকে তিনি বরং আরো জোরালো, আরো গণসমর্থনপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখিয়েছেন, হতে পারে গল্পের প্রয়োজনেই। মুসার মত এক অতি-মানবিক ও অনেকটা অবাস্তব চরিত্র (যিনি মৌলবাদী নন, কিন্তু ভীষণভাবে শক্তিশালী এক জঙ্গি নেতা) তিনি নির্মাণ করেছেন।

এর পেছনেও কাশ্মীরের বাস্তবতা ছাড়িয়ে লেখকের আকাঙ্ক্ষার কাশ্মীর-আন্দোলন আশ্রয় পেয়েছে।

হয়তো এর পেছনে লেখকের কৌশলগত আত্মরক্ষাত্মক বর্মও রয়েছে। তিনি মাওবাদী আন্দালনকে এসবের থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে দেখাতে চাননি নিরাপত্তাগত কারণে, তিলো যেমন নাগাকে বিয়ে করেছিল সেরকম করেই। তিনি বরং পরিণতি হিসেবে একটি পরমানন্দ মন্ত্রণালয়কে এনেছেন– সাহিত্য হিসেবে মন্দ নয়, কিন্তু এর কোনো সচেতন দিশা নেই।

হতে পারে ভারতের বর্তমান বাইরের চিত্রটা এরকমই। আপাতভাবে সেটা কোনোদিকেই যাচ্ছে না। কিন্তু তার গভীরে ঢুকলে এবং এর সঠিক সমাধানের দিকে যেতে হলে আপনাকে আরেকটু সমাজ বিজ্ঞানে ঝুঁকতে হবে। বিপ্লবী সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত, জোয়ার-সংকটকে সেই বিজ্ঞান থেকে বুঝতে হবে। সিস্টেমকে ঘৃণা ও উন্মোচনটা হলো এর অর্ধেক কাজ, এবং অবশ্যই কম অর্ধেক কাজ। বাকী বেশি অর্ধেক ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার রূপান্তরটা কীভাবে হবে সেটা বুঝতে পারা, এবং তার রূপরেখাটাই বা কী হবে তাতে মানুষকে যেভাবে পারা যায় চালিত করা। একজন সাহিত্যিক, ভারতের মত এক মাটিতে যেখানে উত্তরোত্তর ফ্যাসিস্ট হিন্দুত্ববাদ শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেখানে, আর কতটুকুই-বা করতে পারেন!

তবে যেটা পারেন, উপরোক্ত সমালোচনায় উল্লেখিত ক্ষুদ্র কিন্তু বেঠিক অংশটুকু ডিলেট করে দিলেও তার কর্তব্যে ত্রুটি হয়না। সঠিকটা হয়তো বলা যায়না, হয়তো সেটা বলার এটা জায়গাও নয়, হয়তো উপন্যাসটি এভাবেই লেখক রাখতে চান, সবই ঠিক আছে। কিন্তু কিছু ত্রুটিপূর্ণ বাক্য ও উপসংহারমূলক কথা না বলাটা লেখককে পূর্ণতা ও অধিকতর সঠিকতা দিত। একজন অসমাজতন্ত্রী, অকমিউনিস্ট, উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী লেখকের কাছ থেকে অবশ্য সেই চাওয়াটা হয়তো বেশি। তিনি যা সেটাই লিখেছেন। তবে আমরা যারা বিপ্লবে নিয়োজিত, তাদেরকে সেটা বুঝেই উপন্যাসটি পড়তে হবে। রস আস্বাদন করতে হবে। জানতে হবে, যারা অনেক কিছুই জানেন না। জানেন শুধু হিমুর মত এক নৈরাজ্যিক তরুণকে আদর্শ করে তুলে ধরতে। শেষ পর্যন্ত যাদের আশ্রয় হয় আওয়ামী '৭১-চেতনার ডাস্টবিন, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ ও আত্মসুখের মাঝে।

– ২২ মে, ২০২০

যে লোকটি এখন বেঁচে আছে

এই গল্পটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রগতিশীল উর্দু কথাসাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরের (দুর্ভিক্ষ) কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অন্নদাতা' উপন্যাস থেকে সংকলিত তৃতীয় অধ্যায়। কৃষণ চন্দর এই গল্পে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মানবতার অবমাননার করুন চিত্র অংকন করেছেন। শিল্পিত রচনাশৈলীর মধ্যদিয়ে লেখক তৎকালীন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও তার দালাল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রশ্নবিদ্ধ ও উন্মোচন করেছেন। তাদের নির্মম শোষণ-লুণ্ঠন-নিপীড়ন ও অন্যায়যুদ্ধপূর্ণ মানবতাবিরোধী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথানুসন্ধান করেছেন। যার গতিমুখ শোষণহীন-বৈষম্যহীন সমাজ সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার দিকে।

আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি ..... আমার প্রাণহীন দৃষ্টিহীন চোখ দুটো যেন আকাশের অসীম নীলিমায় কি খুঁজে বেড়াচ্ছে অনবরত।

সেবা সমিতি পুলিশ বা আঞ্জুমানের লোকজন আমার মৃতদেহকে সরিয়ে নেবার আগে, কবর বা পুড়ে ফেলার আগে একবার এই দুতাবাসের সিঁড়িতে বসো, শোন আমার কাহিনী। ঘৃণাভরে পালিয়ে যেয়ো না কিন্তু। আমিও মানুষ তোমাদের মতো-রক্ত-মাংসের হাড়ে তৈরি জীব। আজ অবশ্য মাংসের চেয়ে হাড়ই অধিক, গ্রন্থিসমূহ পচতে শুরু করেছে; আর তা থেকে বেরুচ্ছে ন্যাক্কারজনক বিশ্রী গন্ধ। সত্যি কথা। কিন্তু এটাতো বিজ্ঞানেরই মামুলী কর্মকান্ড।

তোমার ও আমার দেহের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, আমার হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে আজ; মগজ হয়েছে নিষ্ক্রিয় আর দীর্ঘদিনের উপবাসে পাকস্থলী কুঁকড়ে বসে গেছে। আমি মরে গেছি সত্য কিন্তু এত ক্ষুধার্ত যে, পেটে এক কণা ভাত পড়লে আমার মৃতদেহ আবার গা ঝাড়া দিয়ে বেঁচে উঠবে। বিশ্বাস না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখো। কিন্তু যাচ্ছো কোথায়? মরামানুষ আবার ভাত চায় দেখে বুঝি ঘাবড়ে গেলে। কলকাতায় মরা মানুষও ভিক্ষা চায়। দোহাই বলছি যেও না। শুনে যাও আমার কাহিনী, চাউলের কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ো না। ও তোমার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে থাক। আমার শরীর পচতে শুরু করেছে তাই তোমার কাছে আমি আর ভাত চাইবো না। এ দেহের জন্য আজ আর এক কণা ভাতও প্রয়োজন নেই। এই দেহই ক্রমশ এক কণা চাউলে

পরিণত হবে। নরম মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে এই মাটির দেহ। মাটিতে ধানের বীজ শেকড় গাড়বে। তারপর একদিন অল্প পানির আস্তরের উর্ধ্বে মাথা তুলবে, বাতাসে সবুজ শিষগুলি মাথা নেড়ে দুলবে। মুখ টিপে হাসবে, হাসিতে ফেটে পড়বে; নরম রোদের সঙ্গেও খেলা করবে; জ্যোৎস্নার হিমধারায় করবে স্নান, কান পেতে শুনতে পাবে পাখীর কলতান। হালকা হাওয়া এসে চুমু দিয়ে যাবে সে ধানের শীষে। আর তখন তার অণুতে জন্ম নেবে এক নতুন রূপ, নতুন জীবন, নতুন এক কণা চাউল। হাঁ, ছোট খোসার আবরণে ঢাকা এক কণা চাল– স্বচ্ছ, শুভ্র, সুন্দর–শুক্তির ভেতরে যেন এক বিন্দু মুক্তো।

আজ একটা গোপন কথা বলবো তোমাকে, মানুষের জীবনে সবচেয়ে গোপন কথাটি যা একমাত্র মরা মানুষই বলতে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তিনি তোমাকে যেন মানুষ না করে এক কণা চালে পরিণত করে। প্রার্থনা করো সনির্বন্ধ অনুরোধ করো, মিনতি জানাও, তপস্যা করো– তোমাকে মানুষ থেকে এক কণা চালে পরিণত করার জন্য– সর্বস্ব দিয়ে বিধাতাকে আবেদন জানাও। জীবনতো মানুষের মতো চালের কণারও আছে। কিন্তু তার জীবন অনেক বেশী মহৎ, অনেক নিষ্কলুষ, অনেক পবিত্র, অনেক সুন্দর । প্রাণটুকু ছাড়া মানুষের আর কিই বা আছে? মানুষের সম্পদ তো আর দেহ নয়; বাড়ীঘর ধনদৌলত নয়– সম্পদ হল তার আত্মা ও প্রাণ। বাকী যা কিছু দেহ, জমিজমা ধনসম্পদ ব্যবহারের পর পেছনে ফেলে যায়। কিন্তু তার মনে আঁকা থাকে কয়েকটি ছবি, কয়েকটি স্মৃতির টুকরো, ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনের উত্তাপ, হয়তো একটি হাসির রেখা। এগুলো নিয়েই মানুষ বাঁচে। আর মরবার সময় শুধু দেহই সাথে করে নিয়ে যায়।

চাউলের কণার জীবনকথা তোমাকে বলছি। এইবার শোনাব আমার জীবনকথা। বিরক্ত হয়ো না কিন্তু। আমার দেহের মৃত্যু হয়েছে সত্যি কিন্তু আমার আত্মা মরেনি। চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বার আগে আমার আত্মা তোমাকে শুনাতে চায় সে সব দিনের কাহিনী, যখন আত্মা আর দেহ এক ছিলো; এক সঙ্গে চলতো, কথা কইতো, হাসতো, বেঁচে ছিলো।

মন আর দেহ। দুয়ের মিলনেই প্রাণ; এ দুয়ের মিলনেই আনন্দ, প্রেরণা সৃষ্টি সব কিছু। মাটি আর পানি যখন মিশে তখনই সৃষ্টি হয় চালের কণা; নর আর নারীর যখন মিলন হয়, জন্ম নেয় এক হাসিখুশি জীবন্ত শিশু। দেহ আর মন যখন এক হয় তখনই জীবন। বসো– তোমাকে আমাদের দু'জনার কাহিনী শোনাই– আজ যারা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেছে। দেহ আর মন– পার্থক্য এইটুকু, দেহ মরে গেলে দুর্গন্ধ বের হয়; আর মন যখন মরে তখন বের হয় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। যদি ভালভাবে দেখো তবে দেখতে পাবে এই ধোঁয়ার

কুণ্ডলীর মাঝে কেঁপে কেঁপে জ্বলে ওঠা আমার অতীত দিনের আবছা আবছা স্মৃতিগুলোকে। বিদ্যুতের ঐ ঝলকানি কি জানো? সে হল আমার বৌয়ের হাসি---হ্যাঁ ঐতো আমার বউ --- লজ্জা কি ? এগিয়ে এসো বন্ধু। এইবার দেখতে পাচ্ছ এই নিষ্কলুষ সৌন্দর্য, এই অজানুলম্বিত একরাশ চুল। লজ্জা-নম্র হাসি, সেই আনত কোমল একজোড়া চোখ– এইতো সেই মেয়ে তিন বছর আগে জেলেদের পাড়ায় সমুদ্রতীরে পড়ন্ত বিকেলে যাকে প্রথম দেখেছিলাম। তখন এক জমিদার তনয়াকে আমি সেতার শিখাতাম। দু'দিনের ছুটিতে দেখতে গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরের আতা পাড়ায় পিসীকে। নির্জন সমুদ্রতীরে বাঁশ আর তালের সারিতে ঘেরা এই শান্ত গ্রামখানি তখন ঢাকা পড়েছিল এক বিষণ্ন চাপা নিস্তব্ধতায়।

জানিনা বাংলার গ্রামে গ্রামে কেন এই বিষাদ। এখানকার মাটি নিথর নিস্তব্ধ। দূর-বিস্তৃত অতলান্ত সাগর, কূল কিনরাহীন, সীমাহীন বাঁশের কুঁড়েঘরগুলি অন্ধকার আর শুধু বিষাদ আর বেদনায় ভরা। বাতাসে শুকনো মাছের গন্ধ। গ্রামের পুকুর সবুজ শ্যাওলায় পরিপূর্ণ। ধানের ক্ষেতে থমকে আছে অন্ধ পানি। দীর্ঘ তালগাছ সবকিছু ছাড়িয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্র বুকভরা ভাষাহীন বেদনা আর নিস্তব্ধতা, জড়তা আর মৃত্যুর আভাস। যে হতাশা আর বেদনা আমাদের প্রেমে দেখতে পাও, আমাদের সমাজে, সাহিত্যে-সংগীতে, তার জন্ম আমাদের এই গ্রামে। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

প্রথম যখন তাকে দেখলাম তাকে আমার চোখে জলপরীর ন্যায় অপরূপ সুন্দরী মনে হলো। সে সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল। আমি সাগর তটে একটা নতুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বালুতটে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা মিষ্টি গলার ডাক শুনলাম, "আমি উঠব, সরে যান ওখান থেকে।" সমুদ্রের দিকে তাকালাম। ঝিকিমিকি কালোচুল আর ঝলমলে একখানা হাসিভরা মুখ। আর বহুদূরে দিগন্ত রেখা একখানা নৌকো। সূর্যের আলোয় রূপোর পাতের মতো শাদা পালখানি ঝিক ঝিক করছিল।

আমি বললাম, "সাত সমুদ্রের ওপার থেকে বুঝি এলে?"

সে হেসে বলল, "না, এই পাশের গ্রামেই আমার বাড়ী। ঐতো আমার বাবার নৌকা। মাছ ধরতে গেছেন। আর আমি তাঁর জন্য ভাত এনেছি; ঐতো যেদিকে যাচ্ছেন ঐ তাল গাছের কাছে ভাত রয়েছে। আমার শাড়ীও সেখানে।"

বলেই ঝলমলে বুদ্বুদের রেখা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগর জলে, তীরের দিকে এগিয়ে এসে বললো, "দয়া করে ঐদিকে যান তো। আর শাড়ীটা আমায় এগিয়ে দিন।"

"কিন্তু একটি শর্তে।"

"ভাত মাছ আমিও খাব। দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে আমার।" সে হেসে উঠল। তারপর মুক্ত তীরের মত পানির বুক চিরে ছুটে গেলো ঠিক যেখানটিতে নীল সমুদ্রে সূর্যরশ্মি আলোর জাল বুনছিলো। তারপর সে ফিরলো; তীরের দিকে সাঁতার কেটে এলো। কিন্তু এবারে এলো ধীরে ধীরে ছোট কিশোরীর মতো খেলা করতে করতে। "তোমার কি হল ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

আজকাল চাল বড় আক্রা। টাকায় মাত্র দু'সের। ভাত তো খেতে দিতে পারবো না।"

তাহলে কি খাবো। আমার তো ভীষণ ....।"

"খান তাহলে লোনা পানি।" সে ঠাট্টা করে আবার সমুদ্রের গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ঘরে বউ হয়ে যখন এলো টাকায় দু'সের চাল।

আমার মাইনে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। বিয়ের আগে ভোরবেলা উঠতে হোত; নিজের হাতে রাঁধতে হোত। কারণ জমিদারের মেয়ের স্কুল সকালে, তার আগেই তাকে সেতার শেখাতে হবে। সন্ধ্যাবেলা দু'ঘন্টা শেখাতাম। দিনের বেলায় যখন খুশী ডেকে পাঠাতেন জমিদার। বলতেন, "বাজাও সেতারখানা, মনটা কেমন জানি উদাস হয়ে পড়েছে।"

তারপর পৃথিবীতে এলো আমাদের ছোট সন্তান----কাছে এসো মা মণি---- আচ্ছা একটু হাসি দেখিয়ে দাও ওদের। ওদের জানিয়ে দাও, "আমি কোন দোষ করিনি। দু'বছর বয়স হয়নি আমার। আমি চাই ঝুমঝুমি আর পুতুল নিয়ে খেলতে। মায়ের বুকে দুধ খেয়ে তার কোলেই ঘুমুতে। আমি এতো নিষ্পাপ যে নিজের কথা বলতেও শিখিনি। আমি শুধু জানি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে, যেখান থেকে ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন বাপ-মায়ের ঘর হাসিতে আলো করে তুলতে, এই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরখানা আমার কচি হাসিতে ভরে তুলতে।"

------- এসো মা লক্ষী আমার। ওদের হাসি দেখিয়ে দাও। হাঁ যা বলছিলাম, এই মেয়ে যখন পয়দা হল তখন টাকায় এক সের চাল। তবু আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছি, যার দয়ায় ধান জন্মায়, আর জমিদারের কৃপায় সেই চালের ভাত খেতে পাই ।

আসল কথা হল, এই ফসল ফলানো আর খাওয়া ইতিহাসের মাঝখানের ইতিহাস, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন,

সাহিত্যের খাঁটি ব্যাখ্যা। জন্মানো (ফসল) আর খাওয়া। দুটি খুবই সোজা কথা। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি একবার মাঝের ব্যবধানের কথা।

টাকায় একসের চাল। তারপর হল টাকায় তিনপোয়া। তারপর আধসের। একপোয়া। তারপর বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গেলো। গাছের ফল নিঃশেষ। তরিতরকারি, মাছ, নারিকেল পর্যন্ত নেই। লোকে বলাবলি করতো, জমিদার ও মহাজনের হাতে নাকি অনেক চাল জমা আছে। কিন্তু কোথায় কেউ জানে না। চালের জন্য অনেককিছু করা হল। অনুনয়, বিনয়, আবেদন, তোষামোদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা, ভগবানকে অভিশাপ সবকিছু। সবই করে দেখা গেলো কিন্তু কোনো ফল হল না। সব গেল, রইলো শুধু ভগবানের নাম– আর রইলো মহাজনের আড়ৎ আর জমিদারের কাছারি।

দুর্ভিক্ষ দেখে জমিদার সেতার শেখানো বন্ধ করে দিলেন। মানুষ মরছে উপোষ করে, কে গান শুনবে? সেতার শেখাবার জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা করে কে খরচ করবে? ক্ষুধা, হতাশা আর একটি দুধের শিশু। স্ত্রীকে বললাম, "চলো কলকাতা চলে যাই, লাখো লোকের বসবাস। হয়তো একটা কাজ পেতেও পারি।"

"চলো কলকাতা যাই।"

"চলো কলকাতায় যাই।" যেন সারাগা এই সিদ্ধান্তই নিয়ে নিয়েছে। গ্রামের মানুষের নিবিড় যোগ যেন একটি দুর্জয় বাঁধ। কিন্তু 'কলকাতায় চলো' রব উঠে এই বন্ধনেও ফাটল ধরিয়ে দিলো। সমস্ত মানুষ ছুটে চললো স্রোতের মতো, কলকাতা চলো 'সবার মুখে' একটি মাত্র কথা। 'চলো কলকাতা চলো।'

নিয়তির পথ বেয়ে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে চললো; যে পথ বাংলার সীমান্ত জেলাগুলোর উপর দিয়ে অবশেষে কলকাতা এসে পৌঁছেছে। ওই পথ জনস্রোতের কাছে একমাত্র আশা ভরসা ।

"কলকাতা, চলো কলকাতা" --- পিঁপড়ের সৈন্যের মতো চলেছে গুড়ি মেরে অর্ধমৃত লোকজন কলকাতার উদ্দেশ্যে অন্নের সন্ধানে। --- মৃত্যুর মিছিল– মাথার উপরে পাক খেয়ে ঘুরছে শকুনির পাল, নধর পরিতৃপ্ত অলুক্ষণে পাখী, খাদ্যের অভাব তাদের নেই। বাতাসে গলিত মাংসের গন্ধ, মেয়েদের হাহাকার আর শিশুর কান্না। প্লেগে মরা ইঁদুরের মতই শকুনি, শিয়াল আর বন্য কুকুরের জন্য মৃতদেহগুলো পথের দু'ধারে ছড়ানো। কিন্তু পিঁপড়ের মতো মানুষ এগিয়ে চলেছে। তারা এসেছে বাংলার সকল প্রান্ত থেকে। সবারই লক্ষ্য কলকাতা।"কলকাতা চলো! কলকাতা চলো।"

কাকে কে সাহায্য করে? কেমন করেই বা করবে? প্রত্যেকটি মানুষ জৈবিক প্রয়োজনে নিজের জান বাঁচানোর জন্য আদিম বর্বরতায় পিঁছিয়ে গেছে।

হতাশা, ক্ষুধা আর মৃত্যু। এই মানুষ নামক পিঁপড়ের দল চলেছে ছুটে, ঘসে ঘসে পা ফেলছে, শতজীর্ণ, শীর্ণ দেহটাকে টেনে হেঁচড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেরাই মারামারি করছে; কাতরাচ্ছে আর্তনাদ করছে; কাশির সাথে উঠে আসছে রক্তের ঢেলা তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। পিঁপড়ের পালের মতো নিয়মের অভ্যাস আর সহিষ্ণুতাটুকুও যদি থাকতো। পিঁপড়ে ইঁদুরও এমন বিভৎসভাবে মরে না।

চলতি পথে এখানে সেখানে মিলছে খয়রাতের ছিটে ফোটা। হিন্দুরা হিন্দুদের আর মুসলমানরা মুসলমানদের ভিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু খয়রাতে তো সমস্যার সমাধান হয়না, প্রাণ কি সে ফিরিয়ে দিতে পারে? ও শুধু প্রতারিত করে– যে দেয় তাকেও, যে নেয় তাকেও। কখনো কখনো ভিক্ষে পেতাম। একদিন পেলাম একটি আস্ত নারিকেল। মেয়েটা কতদিন দুধের জন্য কাতরাচ্ছে। আর তার মায়ের বুক শুকে হয়েছে মাটি। যেন কত বছর যাবত তাতে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি। তার দেহ যেন জীর্ণশুকনা একটি ফুল। মেয়েটাকে চুপ করাবার জন্য তার হাতে গুঁজে দিতাম ঝুমঝুমিটা। এই কাঠের খেলনাটা ছিল তার আদরের বস্তু। শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরতো সেটা। সেদিনও তার হাতে ছিল ঝুমঝুমিটা। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে করুণ মুখে কাঁদছে। যেমন করে ভয়ার্ত আহত জানোয়ার কাতরায়। যতক্ষণ না মরণ এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়।

বলছিলাম, সেদিন পেরিয়েছে একটা পুরো নারিকেল দিয়ে। নারিকেলের পানি দিলাম মেয়েটাকে আর নিজেরা খেলাম শাঁসটুকু। মুহূর্তের জন্য মনে হল পৃথিবীটা যেন নতুন করে জন্ম নিল আরেকবার।

'কলকাতা! কলকাতা চলো।' সেই অফুরানো দীর্ঘ পথ ধরে চলেছি, সকলের ঝুড়ি শূন্য, কারো হাতে কিছু নেই। যার হাতে যা ছিল হয় বিক্রি করে দিয়েছে নতুবা বদল করেছে। বাকী আছে শুধু মানুষের ব্যবসা। উত্তর ভারত থেকে এসেছে মানুষ কেনার খদ্দের। তাদের মাঝে আছে অবলা আর অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার– অবলা আর অনাথ চাই তাদের। বাপ-মায়েরা নিজের হাতে সন্তানকে ধরে দিচ্ছে অনাথ বলে সেই সব ম্যানেজারের হাতে। অনাথ হল যারা গরীবের শিশু– বাবা-মা বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা একান্তই গৌণ। এদের ভেতর সত্যিকারের মানুষের ব্যবসায়ীও রয়েছে– যাদের কোনো নীতির বালাই নেই, ধর্মের ধাপ্পাবাজী নেই, যারা কোনো সামাজিক অজুহাতের ধার ধারে না। হাটের গরু-ভেড়ার মতো মেয়েগুলোকে পছন্দ করে তারা কিনে নিচ্ছে।

"খাসা মাল দেখছি।"
"রংটা একটু ময়লা।"
"বড্ড কাহিল।"
"মুখে আবার বসন্তের দাগ।"
"মাংস কইগো গায়ে, হাড়ই সার।"
"থাকগে ওতেই চালিয়ে নেবে ছুঁড়ি।"
"দশ টাকা দিয়ে দাও।"

স্বামী বিক্রি করলো স্ত্রীকে; মা বেচে দিল মেয়েকে, ভাই বিক্রি করলো বোনকে। অথচ আজকের এই দুর্দশার আগে কোনও দিন এই সব দালাল আর পতিতালয়ের মালিকরা এই ধরনের ইঙ্গিত করবার সাহস করলে খুন করেই ফেলতো এরা। কিন্তু আজ তারা ঘরের মেয়েদের শুধু বেচেই দিচ্ছে না, নির্লজ্জ দোকানদারের মত যে যার মালের গুণকীর্তণ করছে। ধর্ম, আদর্শ, নীতি, মাতৃত্ব– মানবতার সমস্ত আদর্শ আজ কি নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জীবন হয়েছে তার জৈবিক নগ্নতায়– রক্তচোষা, ক্ষুধার্ত, নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর বনের পশুর ন্যায়।

স্ত্রী বলল, "আমার মেয়েটাকেও বিক্রি করলে কেমন হয়।" ভয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করে সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। আড় চোখে সে একবার তাকালো আমার মুখের দিকে, পর্যবেক্ষণ করছে তার কথার চাবুকে আমার কেমন প্রতিক্রিয়া হয়। তার চোখে মুখে অপরাধীর লজ্জা, যেন সে নিজে তার মেয়ের গলাটিপে হত্যা করছে; তার স্বামীর পিঠে জামা কাপড় খুলে চাবুক মেরেছে, যেন সে নিজের হাতে গলায় দড়ির গিঁট দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ সে মারা গেছে তাই কোনো অভিযোগ করব না। যখন সে ওকথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে তখনই তার সত্যিকারের অপমৃত্যু ঘটেছে, হয়তো ওকথা উচ্চারণের আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত – আমার মৃত্যুর পরেও আমি বুঝে উঠতে পারি না, তার মুখ দিয়ে কেমন করে ওকথা বের হয়েছিল, কেমন করে এ সম্ভব হ'ল? কোন নিদারুণ শক্তি তার মাতৃত্বকে হত্যা করেছিল; তার আত্মাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল? আজও আমার মনে পড়ে তার কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে, তার দিকে রাগ ও তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ক্রোধ আর বিরক্তি যেন তাকে স্পর্শ করেনি। আমার পেছনে পেছনে অন্ধের মতো, কলের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে লাগলো। ধুলোয় তার রুক্ষ চুলে জট ধরেছে; শাড়ীখানা শতছিন্ন, ডানপায়ের ঘা ফেটে রক্ত পড়ছে। তার সেই চোখ, তিনবছর আগের জলপরী আজ

কোথায়? সেই তন্বী, লাবণ্যময়ী নারী যাকে দেখেছিলাম সোনালী মাছের ন্যায় সাঁতার কাটতে? ----- সেই অনুপম রূপ, যার মধ্যে জড়ো হয়েছিল তাজমহলের মহিমা, ইলোরার মায়া, আর অশোকের শিলালিপির অমরত্ব।

সে আজ কোথায়? কেন আজ এই রূপ, এই প্রাণ, এই মাতৃত্বের গৌরব পথের ধুলায় পায়ে দলা বিকৃত শবের মত পড়ে আছে? এ যদি সত্য হয় যে নারী এক পরম বিস্ময়। এ যদি সত্য হয় যে, নারীই জীবন, তার মঞ্জিল, নারীই উৎস, জীবনের সত্য, তবে আজ বলব যে এই সত্য এই বিশ্বাস, এই পরম বিস্ময়ের উৎসএক কণা চাল, যা না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আমার কোলে মাথা রেখে জলপরী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। ক্লান্ত আর ধুলোমাখা নোংরা দেহ এলিয়ে পথের ধারেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। বার কয়েক চাপা কান্নার দমক – তারপরেই দেহ ছেড়ে প্রাণপাখি উড়ে চলে গেলো।

জানিনা কেন, কিভাবে তাও বলতে পারবো না –মনে ভেসে উঠল অতীত স্মৃতি যখন তাকে সর্বপ্রথম চুমু খেয়েছিলাম, আর তার দেহের গন্ধ মনে করে দিয়েছিল যুঁইফুলের সুবাসকে। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তেও সে একই সৌরভ যেন ভেসে এলো। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তার মরা ঠোঁট দু'টোর দিকে মুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে রইলাম। অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল সেই ঠোঁট দু'টোর উপর; তার চোখ আর গালের উপর। মাত্র উনিশ বছরে, না খেয়ে, অগাধ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে, ধুলোমাখা দেহে, শতজীর্ণ কাপড় পরণে, আমার কোলে মরে পড়ে আছে। সেই জলপরীকে মরবার সময় আজ কেমন জানি ডাইনীর মত দেখাচ্ছিল। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, ভগবানের বিরুদ্ধেও নয়। সেই যে অন্ধ মিছিল নির্লিপ্তের মত পাশ কাটিয়ে চলে গেলো ঐ পথ বেয়ে– তাদের বিরুদ্ধেও আমার কোনো অভিযোগ নেই। শুধু যদি এমনি করে তাকে মরতে না হতো। আমি একজন মানুষ না শুধু বন্ধু হিসাবে ভগবানের কাছে জানতে চাই; সে এমন কি করেছে যার জন্যে এই হ'ল তার পরিণাম? বেঁচে থাকলে সে সাদামাটা জীবনযাপন করতো।

ছোট একটা ঘর, স্বামী আর সন্তান, সাধারণ জীবনের মোটা সুখ– এই নিয়ে যদি সাধারণ মানুষের মত পুরো জীবনটা বেঁচে থাকতো তবে কার কি ক্ষতি হতো? এই রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা জীবনে বেশি কিছু আশা করে না, মান চায় না, ধন চায় না, সাম্রাজ্য কিংবা ঋষিত্ব চায় না – অথচ এই সামান্য সুখ থেকেই বঞ্চিত হয় তারা। সে তেমনি বঞ্চিত হয়েছে। এমনভাবে তাকে কেন মরতে হল? যদি মরতেই হয়; তবে তার নিজ গ্রামে, সমুদ্রের তীরে, নারিকেলের ডালে কাঁপা বাতাসে তার শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে পারলো

না কেন? তাকে মরতে হল এমনি জঘন্যভাবে; মৃত মানুষের অরণ্যে যেখানে চারদিকে জীবিতের কাতরানি; শ্রান্ত, ক্লান্ত পা ফেলার শব্দ আর বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষুধার্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ? আমি তাকে কবর দিইনি। তাকে পুড়িয়েও আসিনি। তাকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখেই মেয়েটাকে কোলে নিয়ে চলে এসেছি।

কলকাতা তখনো বহুদূরে– মেয়েটিও কয়দিন কিছু খায়নি। সে আর কাঁদতেও পারে না। গলা থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। পানি থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মত ঠোঁট দু'টো ফাঁক করে আর বন্ধ করে ফেলার শক্তিটুকু আছে। এই ছোট্ট জলপরীর হাতে ধরা ছিল তখনো সেই কাঠের ঝুম্‌ঝুমিটা। নিভে আসা প্রদীপের ন্যায় আমার চোখের সামনে মরে যাচ্ছে অথচ আমার কিছুই করবার নেই; আমি তখনো এগিয়ে যাচ্ছি। আমার সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মানুষ আর মানুষ। ওরা এগিয়ে চলেছে। মৃত্যুর মিছিল। প্রত্যেকে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে; প্রত্যেকে পার হয়ে চলেছে সেই মৃত্যুর বন্ধুর উপত্যকা। প্রত্যেক জোড়া চোখ, প্রত্যেকটি মুখে পড়েছে একই ছায়া---- আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালাম; হে বিধাতা, হে আকাশ মাটির স্রষ্টা, এই নিষ্পাপ শিশুটির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও।------জগতের প্রভু, হে অন্নদাতা, তোমার এই বিরাট পৃথিবীতে, তোমার রাজত্বে এক ফোঁটা দুধ, কি এক মুঠো অন্নও জুটবে না এই শিশুটির কপালে? দেখো চেয়ে দেখো, এর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, কেমন করে শুকনো মুখখানা হাঁ করছে আর তারপরেই বন্ধ হয়ে আসছে। দেখো ক্ষুধার জ্বালায় তার শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে, হে ভগবান, লোকের কাছে শুনেছি মরণ নাকি সুন্দর। কিন্তু নিশ্চয় এ মরণ সুন্দর নয়। এই শিশুর অনেক ভালভাবে মরা উচিত– হে ধ্বংসের দেবতা, এ আধ ফোঁটা কুঁড়িকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য একটা ঝলমল করা বুদ্বুদের মতো, ঢেউয়ের বুকে দোলা নৌকার মতো, গানের বিরাট পর্দার ন্যায়, তালের সারির ন্যায় প্রথম চুম্বনের মতো এই অপরূপ স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে এত উদগ্রীব কেন তুমি? হে নিষ্ঠুর অন্ধ বিধাতা, এর কি কোনো মূল্য নেই। প্রার্থনা অভিশাপের কোনো ফলই হয় না। আমার মেয়ে মারা গেল। সেই শেষ মুহূর্তের কি ভয়াবহ যাতনা। আমার এই মৃত পাথরের মত চোখ দু'টোকে জিজ্ঞাসা করো, তারা বলবে কি দৃশ্য দেখেছিল।এক ফোঁটা দুধের জন্য কঁকিয়ে কঁকিয়ে সে মারা গেল।

আকাশ থেকে একফোঁটা দুধও ঝরে পড়লো না। মাটির বুক চিরে একফোঁটা দুধ উঠে এলো না। নির্মম আকাশ। নির্মম মাটি। আর সামনে এই দুস্তর প্রাণহীন নির্মম পথ।

মরবার কয়েক মুহূর্ত আগে সে আমাকে দিয়েছিল তার হাতের ঝুম্‌ঝুমিটা। সেটি এখনও আমার হাতের মুঠোয় ধরা আছে। এই তার সম্পদ সে আমাকে দিয়ে গেছে। না, সে এমন সরল বিশ্বাসে আমার হাতে এটা দিয়েছিল যে আমার বিশ্বাস, সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে গেছে। আমাকে দিয়ে গেছে পুরষ্কার। সস্তা দামের একটা কাঠের ঝুম্‌ঝুমি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যদি সে ক্লিওপেট্রা হত তবে আমাকে দিতো তার সমগ্র প্রেম, যদি সম্রাজ্ঞী মমতাজ হতো তবে দিয়ে যেত তাজমহল, যদি রানী ভিক্টোরিয়া হতো তবে দিয়ে যেত তার সমগ্র রাজত্ব। কিন্তু ছোট এক অভাগা শিশু, তার ছিল মাত্র একটি কাঠের ঝুম্‌ঝুমি। তাই– সে দিয়ে গেছে তার সর্বহারা পিতাকে। কে আছে যে এই কাঠের খেলনার দাম যাচাই করতে পারে? তোমরা যারা ধনী হয়েছো, মানুষের তুচ্ছ ত্যাগের ঢাকঢোল পিটাও, তারা নিয়ে যাও এই কাঠের ঝুম্‌ঝুমি। একে প্রতিষ্ঠা করো মানবতার মন্দিরে; যে মন্দির আজ থেকে হাজার বছর পর একদিন তোমাদের সকলের জন্যে আমার আত্মা গড়ে তুলবে।

অবশেষে কলকাতা পৌঁছালাম। উপবাসী, জনহীন, মানবহীন নগরী। প্রাণহীন, নির্মম নগরী কলকাতা। আশায় নেই, একমুঠো অন্ন নেই। শিয়ালদা স্টেশন, শ্যামবাজার, বড়বাজার, হ্যারিসন রোড, জ্যাকারিয়া স্ট্রীট, বৌ বাজার, সোনাগাছি, নিউমার্কেট, ভবানীপুর কোথাও এককণা ভাত মেলেনি। কোথাও মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেনি। উপবাসী মানুষ আড়ম্বরপূর্ণ হোটেলের সামনে মরে পড়ে আছে। একই ডাস্টবিনে কুকুর আর মানুষ অন্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। উচ্ছিষ্টের অংশ নিয়ে মানুষ কুকুরে লড়াই চলছে। আর বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায় বিপুলাকার মোটর ছোটে, ভেতরে চলছে হাসির ফোয়ারা।

নগ্ন উপবাসী দেহে বেরিয়ে পড়া পাঁজরের জোড়াগুলোকে মনে হয় যেন লোহার শেকল। সেই শেকলে প্রাণকে ওরা বেঁধে রেখেছে? বেরিয়ে পড়ুক সে প্রাণ। এই ভয়াবহ কারাগারের দরজা খুলে দাও .....বিদ্যুতের ঝলকের মতো আরেকটা মোটর ছুটে যায়। কিন্তু দেহ তো আত্মার কান্না শোনে না। ---- মা মরছে; ছেলেরা ভিক্ষে করছে। স্ত্রী মরছে আর স্বামী ঘ্যানর ঘ্যানর করছে– রিক্সায় গমনকারী সাহেবের কাছে পয়সা ভিক্ষা চাইছে। যুবতী মেয়েটি একেবারে উলঙ্গ। কিন্তু তার খেয়ালই নেই যে উলঙ্গ কিংবা সে যুবতী।

এমনকি তার খেয়াল নেই যে সে একজন নারী। সে শুধু জানে সে ক্ষুধার্ত আর এটা কলকাতা শহর। ক্ষুধা সৌন্দর্যকে পর্যন্ত হত্যা করেছে।

এই দুতাবাসের সিঁড়ির গোড়ায় আমি মরছি। আমি প্রলাপের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছি। কারা যেন কাছে এসে দাঁড়াল। তারা আমাকে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কানে এল অস্পষ্ট ফিসফিস কথা; "হারামীকে মনে হচ্ছে হিন্দু। চলো ফেলে যাই।"

ওরা চলে গেল ----চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে।

আবার কারা যাচ্ছিল। আমাকে দেখে ফিরে দাঁড়াল, "কে তুমি ?"

একজন পথচারী জিজ্ঞাসা করে। অতিকষ্টে ভারী ঠোঁট দু'টি তুলে উত্তর দিলাম,"আমি ক্ষুধার্ত।"

"হারামজাদা মুসলমানের মতো দেখতে।"

ক্ষুধা ধর্মকে পর্যন্ত গলাটিপে হত্যা করেছে।

চারিদিকে অন্ধকার। আলোর চিহ্নমাত্র নেই। নিস্তব্ধতা চারিদিকে আর গভীর নির্জনতা।

হঠাৎ আনন্দের শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে; গির্জায় গির্জায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল মধুর আনন্দ সংবাদ। খবরের কাগজ হাতে হকার চিৎকার করছে দিনের সেরা খবর :–

"তেহরানে ত্রিশক্তির মিলন। নেতৃবৃন্দের ঘোষণা -- নতুন পৃথিবীর জন্ম, নতুন পৃথিবীর জন্ম।"

আনন্দ-বিস্ময়ে আমার চোখজোড়া বিস্ফোরিত হয়ে উঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি হয়ে গেল নিথর। সেই থেকেই বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে আছে আমার চোখজোড়া।

আমি রাজনীতিক নই। আমি একজন সেতার বাদক। আমি শাসক নই, যারা শাসন মেনে চলে আমি তাদেরই একজন। কিন্তু কোনো দরিদ্র সংগীতজ্ঞের হয়তো প্রশ্ন করার অধিকার আছে; আমাদের মতো দুনিয়ার হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ যারা দরিদ্র, যারা উপবাসী, যারা শোষিত--- তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে কি এই নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে?

এই প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করছি, কারণ ত্রিশক্তির নতুন জগতে আমি বাঁচতে চাই; আমি তো ঘৃণা করি ফ্যাসিবাদ, ঘৃণাকরি অত্যাচার আর অন্যায়কে।

আমি রাজনীতিক নই। কিন্তু সংগীতজ্ঞ হিসাবে এইটুকু বুঝি, যে গানে বেদনার সুর বিরাজমান, সে গান শ্রোতাকেও ব্যথাতুর করে তোলে। যে মানুষ ক্রীতদাস সে অন্যকেও দাস করে তোলে। পৃথিবীর পাঁচজনের একজন মানুষ

হচ্ছে ভারতীয়। যে শৃংখলে প্রতিটি ভারতবাসী বাঁধা আছে, অন্য চারজন পৃথিবীর মানুষ তার জন্য ব্যথা পায় না, এ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সেতারে একটা তার বেসুরো থাকে, ততক্ষণ সমস্ত রাগিনী বেতালে বাজতে থাকে। যতক্ষণ একজন অনাহারে থাকবে, ততদিন সমস্ত পৃথিবী উপবাসী থাকবে। যতদিন একটি মানুষ দরিদ্র থাকবে, প্রত্যেকেই ততদিন পর্যন্ত দরিদ্র থাকবে। যতদিন পর্যন্ত একটি মানুষ পরাধীন থাকবে, এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ ততদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

তাই আমার প্রশ্ন, ভেবো না আমি মরে গেছি। যদি মরবার হয় তবে তুমিই মরেছ। আমি বেঁচে আছি। আর সর্বক্ষণ আমার এই মৃত দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে এই এক কথাই জিজ্ঞাসা করব, তোমার ঘুমে আমি হানা দেব। তোমার মধুর স্বপ্নকে আমি রাতের বিভীষিকায় পরিণত করব। আমি তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবো। তুমি কোনো পথ চলতে পারবে না। তুমি খেতে পারবে না। তুমি কাজ করতে পারবে না। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। যতদিন না আমার মনের মতো উত্তর দিতে পার -- আমি ততদিন মরবো না, আমি মরতে পারি না।

এই ধরার বুকে বাঁচবার জন্যই আমার প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, কারণ পথের ধারে আমার জলপরীকে ছেড়ে এসেছি, তাকে সৎকার পর্যন্ত করিনি। আর এখনও আমার হাতে রয়েছে সেই ঝুম্‌ঝুমিটা।

* *

গল্প

বন্দুক

(মে '৮১)

– কাজল

জয়নগর গ্রামের প্রতি কণা ধূলি বালির সাথে হাসু শেখের কয়েক পুরুষের রক্ত আর ঘাম মিশে আছে। পূর্ব পুরুষরা ক্ষেত মজুরের কাজ করতো। উত্তরাধিকার সূত্রে তাকেও একই কাজ করতে হচেছ। চৈত্রের আগুন ঝরা রোদ, শ্রাবণের মুষলধারার বৃষ্টি, পৌষের হাড় কাঁপুনে শীত– সবকিছুকে উপক্ষো করে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের লাঙ্গল, কাস্তে আর নিড়ানী চলেছে অবিরাম। তবুও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, পরনে কাপড়, রোগে চিকিৎসা জোটে না। ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার কথাতো চিন্তা করাই যায় না। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দাদা, বাবা, চাচা কেউ কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি; একটু চেষ্টাও পর্যন্ত করেনি। পূর্ব পুরুষের প্রতি রাগে ক্ষোভে ধিক্কার দিতে ইচছা করে হাসু শেখের।

মনভরা আশা আর বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে হাসুকে স্কুলে পাঠিয়েছিল তার বাবা। বই খাতা জোগাতে না পেরে এবং স্কুলের বেতন দিতে না পারায় যেদিন তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল–– সেদিন তার বাবা শুধু বলেছিল, "আমাগোর কপালে আল্লায় লেখাপড়া রাহে নাই"। অনাহারে অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় দাদা যখন মৃত্যু শয্যায় তখনও তিনি বলেছিলেন, "কপালের লিখন কি করমু।" একই কথা শুনেছে আরো অনেকের মুখে।

যে ভাগ্যকে বাপ দাদারা সাত পুরুষ ধরে দোষ দিয়েছে, কপালের লিখন বলে যার কাছে হার মেনেছে– তাকে পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো হাসু শেখ। একাতো পারবে না; পাড়ায় অন্যান্য ক্ষেত মজুরের সাথে আলাপ করলো। নিজের চিন্তাভাবনাগুলো খুলে বললো তাদের কাছে।

– হ, কইলা তো ঠিক কথাডাই। কিন্তুক কি কইরা আমরা এই অবস্থাডা পালটামু? ধনী আর গরীব তো আল্লায় বানাইছে। বলে উঠলো একজন মাঝ বয়সী লোক।

– না চাচা, ধনীরা আমাগোর পরিশ্রমের ফসল লুইট্যা খাইতাছে। এইভাবেই তারা ধনী হইতাছে, টাকার পাহাড় জমাইতাছে। আর আমরা সাত পুরুষ ধইরা কাম কইরাও পোলাপান লইয়া চাইড্যা ভাত খাইবার পাইনা। এহন আমাগোর দেরি করনের সুময় নাই। চাচা লও হক্কলেই সর্বহারা পার্টিতে

যোগ দেইগা। হাছা হাছাই পার্টিডা গরীব মানুষের দুঃখু কষ্ট দূর করণের লাইগা কাজ করতাছে। বুঝলানা চাচা, এই পার্টিডাই তো আমাগোর উপর অত্যাচারী সুদখোর, লুচ্চা, বদমাইশগোরে খতমের মইধ্য দিয়া মুক্তির যুদ্ধ শুরু কইরা দিছে। এগোর লগে আমিও যোগ দিমু। তোমরাও যোগ দেও চাচা, ভালা অইব।

– আরে বাবা আমি বুড়া মানু, যুদ্ধ ফুদ্ধ কি আর করবার পারমু?

– হগলের যুদ্ধ করন লাগবো না। যে যেই রকম পারে– সে হেই রকমই কাম করবো। হেইতেই অইব।

– আমারে তাইলে পার্টিডারে খোঁজ কইরা দিও। কোন সুময় যদি একটু আধটু কাম করবার পাই তো করমু।

– হ, চাচা এতদিন পরে বুঝবার পারছ। এই বুঝাডা যদি আরো আগে অইতো তা অইলে আমাগোর কপালে এহন এত দুক্ষু থাকত না। আইজ রাইতেই তপনের বুগলে যামু। কয়েকদিন অইল তপন আমার লগে এই রকমের কি জানি কইবার চাইছিল।

– জানুর পোলাডার কথা কইতাছ না? পোলাডা বড় ভালা মানুষ; আমার লগেও কাইলকা সহালে কত আলাপ কইরা গেল। হেও তো কইছে আমাগোর ভাগ্য আমাগোরই পাল্টানো লাগবো। আর অনেক কথা কইছিল। কথাগুলাইন খুউব ভালা লাগছে আমার টাইন। খুজ লও বাবা, খুজ লও। পার্টিডারে খুইজা বাইর কর।

হাসু মনে মনে ভাবছে রাতেই তপনের ওখানে যাবে। কিন্তু ওখানেও যদি পার্টির খোজ পাওয়া না যায়, তাহলে–

ভাগ্যকে কেমনে পরিবর্তন করবে? যুদ্ধ করবার বন্দুক পাবে কোথায়? পার্টির লোকেরা তাদের কাছে আসে না কেন? এ জন্য পার্টির প্রতি অভিমান হলো হাসুর। রাতের খাওয়া সেরে তপনের বাড়ীতে রওয়ানা দিল হাসু। আজ যেন তার প্রতি কণিকা রক্ত বিন্দু বিদ্রোহন্মুখ হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন এক বিশাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য যাচেছ সে। কাঁধে বন্দুক, সাথে আরো কয়েকজন শত্রুর এক বিশাল ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য যেন এগিয়ে চলেছে। আবছা আবছা অন্ধকার থেকে একজন বলে উঠলো, কে এদিকে এগুচ্ছে? এতে হাসুর শরীর কেঁপে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে দেখে– সাথে কেউ নেই, কাঁধেও বন্দুক নেই। সে যেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছে। ইতিমধ্যে আরো দুই তিনজন একই সঙ্গে বলে উঠলো কে? কে? কথা না কইলে গুলি করমু। গুলির কথা শুনে হাসুর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

নিজের নামটা উচ্চারণ করবার মত শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে। অনেক কষ্টে উত্তর দিল, আমি। আমি হাসু শেখ।

তুমি এত রাতে কোথায় যাইতেছ? বলতে বলতে একজন কাছে এসে পড়তেই চিনতে পারলো হাসু। বলে উঠলো, কেডা তপন না?

– হ্যাঁ আমি।

– তোমার বুগলেই তো যাইতাছিলাম।

– আমার বুগলে? কি মনে কইরা?

– আমিও তোমার লগে যুদ্ধ করমু। বন্দুক চাই। একটা বন্দুক আমারে দেও। তোমাগর লগে আমারে লইয়া যাও। বাপ-দাদা যারে কপালের লেখা মনে করছে– আমি তার পরিবর্তন করবার চাই। তপন তার সাথে হাতে হাত বুকে বুক মিলিয়ে বললো, ধন্যবাদ কমরেড। আমরা জানতাম তুমি জনগণের বাহিনীতে আসবেই। সাথের অন্য দুইজন কমরেডের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিল তপন। সকলের সাথেই হাসু হাতে হাত, বুকে বুক মিলালো। সে অনুভব করলো, তাদের মধ্যে যেন কতদিনের পুরানো বন্ধুত্ব পাতানো রয়েছে। বহুদিন পরে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

***

স্মৃতিচারণ

ভাইয়ার শিক্ষা

–বেনজির

জিতবার মতো আছে সারা দুনিয়া। হারাবার মতো এমন কোন সম্পদ আমার নেই। আছে কেবল পায়ের শিকল। দুনিয়াটাকে জিতব বলেই মনে পড়ে তাঁর স্মৃতি– বারে বারে, প্রতিক্ষণে। ভাইয়া ছিলেন মেহনতি মানুষের নয়নের মণি। আজও আছেন। আগামীতেও থাকবেন তাদের মুক্তির দিশারী হয়ে। সেই দিশারীর স্মৃতিচারণ করা আমার মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কতটুকুই-বা সম্ভব। তা আঁচ করা কঠিন নয়। তবুও সাহসের ডানায় ভর করছি। পারবো কিনা জানিনা। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই। ভাইয়া যেমন বলেছেন– "হাজারো প্রতিকূলতার মাঝেও যদি খেই না হারিয়ে লেগে থাক দৃঢ়ভাবে, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেই।"

'৭৩-এর এপ্রিল মাস। ১৩ তারিখ হবে হয়তো। চিটাগাং যেয়ে পৌঁছলাম আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ রেলপথ পাড়ি দিয়ে। পড়ন্ত বেলায় কুরিয়ারের সাথে উঁচু-নিচু পথ চলা। কাঁধে ঝোলানো কালো ব্যাগ। পথ-ঘাট সবই নতুন। অচেন-অদেখা সব। সাথী কমরেড আমার বিভিন্ন কৌতুহলী প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন বার বার। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর কর্ম চঞ্চল পুরাতন শহরের এক বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়ালাম এসে।

ঘরে ঢুকেই বাম দিকে ঘাড় ফেরাতেই ভাইয়া এক মুখ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন– "এসো, বস। তারপর, কি খবর? ভালতো সব? সেলিম, আম্মা – ওরা কেমন আছে, ভালো আছে তো?" এক সাথে অনেকগুলো প্রশ্ন। অনেকদিন পর দেখা হলো। তাই এত উদগ্রীব কুশল জানতে। হাত মেলানো অবস্থাতেই পাশের চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দিলাম প্রশ্নগুলোর। এর পর আরো কিছু জানাজানি। তার পর কাজের কথা, আলাপ শেষ হলো। তিনি চলে গেলেন। মনে হলো আমার অপেক্ষাতেই এতক্ষণ তিনি বসে ছিলেন। যাবার বেলায় ব্যক্ত করে গেলেন এক স্বাভাবিক প্রত্যাশা– "আশা করি বিশ্বস্থতার সাথে প্রতিকুলতার মাঝেও দায়িত্ব পালন করে যাবে দৃঢ়ভাবে।" কি বলেছিলাম মনে নেই। তবে চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল দৃঢ় প্রত্যয়। আর একবার হাত

বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন ভাইয়া এবং বললেন, "নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেবো আকবরের মাধ্যমে।"

সম্ভবতঃ ২৮ তারিখে নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম। দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সব সময়ই মনে পড়তো সেই সাক্ষাতের কথা। মূল্যবান উপদেশের কথা। হাসি ভরা চেহারাখানি! কি নিস্কলঙ্ক পবিত্রতার ছাপ! উজ্জ্বল চোখে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি– যেন অন্তর্ভেদী। মিষ্টি মধুর স্বল্প বাকে কত দৃঢ়তা! কত আশা! এমন মহান ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন আমি হইনি কখনো। এইতো যোগ্য দিশারী! উত্তাল তরঙ্গ-মালায় শক্ত হাতে হাল ধরে সামনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে তরণী কূলে ভিড়িয়ে যাত্রী পারাপার সম্ভব এমন নিঃশঙ্ক মাঝির পক্ষেই।

পনেরো দিন পর পর অথবা প্রতি মাসে আমার যাবতীয় খরচ-পাতির হিসেব জমা দিতে হতো। খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত ও ঘামে উপার্জিত সাহায্য কখন কোথায় কিভাবে আমি খরচ করতাম– তার হিসেব। সেই "শ্রমিক আন্দোলন" থেকেই অর্থ সংকট দারুণ, সেলিম ভাইয়ের কাছে শুনেছি সেই অতীতের নিদারুণ কাহিনী। না খেয়ে থাকার কথা। মাইলের পর মাইল হাঁটা, পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। কিন্তু জনগণের মাঝে কাজ চালাতো। পার্টি বিকাশের কাজ। আজও তা অব্যাহত। ততখানি না হলেও আমিও তার ছোঁয়া পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে। নানা জায়গায় যাতায়াত করতে যেয়ে ট্রেনের ভাড়া ফাঁকি দিয়েছি কতবার। তবুও প্রায়ই তিনবেলাই তন্দুর রুটি খেয়ে থাকতে হতো। মাঝে মাঝে তাও জুটতো না।

একটা বদ নেশা আঁকড়ে ধরেছিল আমায়। তা কাটানোর চেয়ে বিকাশের দিকেই উৎসাহ ছিল বেশী। নেশাটা ছিল চায়ের। যা আমার জন্য ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর এরং সর্বহারা পার্টির কর্মী হিসেবে তো বটেই। সারা দিন কেবল চা পান ক'রেই কাটাতাম যেন। প্রয়োজনে গাড়ীতেও চড়তাম না। হেঁটে হেঁটেই প্রোগ্রাম সারতাম। তার পর শেল্টারে পৌঁছার আগে রাত এগারোটার দিকে সস্তা হোটেলে বার আনার ভাত ও আট আনার তরকারী খেয়ে মাইল খানেক হেঁটে শেল্টারে উঠতাম।

সস্তা থাকার ফলে কোন কোনদিন অতিরিক্ত হাঁটা পড়লে চা পানের পরিমাণ পঁচিশ থেকে তিরিশ কাপও হয়ে যেতো। আর এভাবেই হিসেবের খাতায় চায়ের কাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতো এবং খাতার কাগজগুলোও খরচ হতো বেশী। ভাইয়ার সরাসরি পরিচালনাধীন থাকাতে তাঁর কাছেই হিসেবের খাতা জমা দিতাম। মনে পড়ে সেদিনের কথা। সম্ভবতঃ বারই জুলাই হবে। যেদিন ভাইয়া সমালোচনা করেছিলেন।

'চা পান করলে এনার্জি পাওয়া যায় এবং প্রতি কাপ চা পানের পর কাজ করার উদ্যমও যেন বাড়ে' –– আমার এ বক্তব্য মতাদর্শগতভাবে খণ্ডন করে পার্টির অর্থনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং তাঁর নিজের উদাহরণ তুলে ধরেন। সত্যিই ভাইয়ার কোন বদ-অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি কিভাবে এতো পরিশ্রম করার শক্তি পেতেন! এটা দৃঢ় মতাদর্শের কারণেই সম্ভব হতো। অনেকেই বলেন, 'ধুমপান না করলে ব্রেন খুলে না বা চিন্তা করা যায় না'। এটা নিজেদের নেশাটাকে দূর করতে না পারার অদৃঢ়তাকে ঢাকার জন্যই নিছক অজুহাত। ভাইয়ার উপদেশগুলো আজও মনে আছে। সেদিনের পর থেকেই চায়ের নেশাটা ছাড়িয়ে দেই। ওটা এক ধরনের অভ্যাস। মানুষ কখনো অভ্যাসের দাস হতে পারেনা। বরং অভ্যাসই মানুষের দাস। যখনি নেশাটা আকুলি-বিকুলি করতো তখনি মনে পড়তো ভাইয়ার কথা– "এটা অপচয়"। "খেটে-খাওয়া মানুষের রক্ত ও ঘামে উপার্জিত পয়সা অপচয় করার অধিকার কারো নেই"। "চা-বিড়ির নেশা হচ্ছে এক ধরনের বিলাসিতা"। "জনগণ বিলাসিতা পছন্দ করে না"। "বিলাসিতা করলে জনগণের সাথে মেশাও যায়না"। "তাছাড়া সামান্য এ নেশাটুকু ত্যাগ করার মতো দৃঢ়তা যদি না থাকে তাহলে আত্মত্যাগের দৃঢ়তা কোথায় পাবে"? "আমি বুঝি– একদিন-দু'দিনেই তুমি এ নেশা ত্যাগ করতে পারবেনা। এজন্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তোমার মতাদর্শগতভাবে সচেতন হওয়া এবং দৃঢ়তা অর্জন করা"। "তুমি এক কাজ করো– যখনি তোমার চায়ের নেশা পাবে তখনি মনে মনে শহরের বা গ্রামের গরীব মানুষের ছবি কল্পনা করো– কেমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও পেটের ভাত জোটাতে পারে না তারা। কত কষ্ট তাদের . . . . "। " আমার মনে হয় এভাবে চিন্তা করলে তুমি যদি সত্যিকারভাবে জনগণের সেবা করতে চাও– তাহলে তোমার এ বদঅভ্যাসটাকে পরিত্যাগ করতে পারবে"। হয়তো আরো সুন্দরভাবে বলেছিলেন। আরো উপদেশ-পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার তখনকার সে হাসিভরা মুখে স্বভাবসূলভ ভঙ্গিমায় কথা বলার ছবিগুলো সিনেমার রীলের মতই আজকে স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠে।

ভাইয়া আজ নেই, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংকলনে লেখা দিতে যেয়ে তাঁর অমূল্য উপদেশগুলো গভীরভাবে স্মরণ করছি পার্টির বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। আজও আমাদের অনেক কমরেডরাই চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের নেশায় ভুগছেন– ত্যাগ করতে পারেন না। তারা কাদের পয়সায় নেশা করছেন তা এখনো সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না। যদি কেউ উপলব্ধি করেন, কিন্তু নেশা ত্যাগ করার মতো দৃঢ় মানসিকতা দেখান না।

এমনকি অভ্যাসটা ত্যাগ করার জন্য " বোকা বুড়ো"র মতো লেগে থাকার শিক্ষাও গ্রহণ করেন না। মেহনতি মানুষের কষ্টে উপার্জিত পয়সা নিজেদের সামান্য নেশায় খরচ করা মোটেই যথাযথ নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সর্বহারা মতাদর্শের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাণের চেয়ে এমন কি প্রিয় বস্তু আছে? সেই প্রাণটাকেই যদি আমরা জনগণের স্বার্থে হাসিমুখে বলিদান করতে প্রস্তুত থাকি তাহলে আর এমন কি স্বার্থ থাকতে পারে যা আমরা ত্যাগ করতে পারবো না?

আমাদের পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি। জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। তাদের সে সাহায্যকে অপচয় করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু তবুও আমাদের অনেক কমরেডই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ-সম্পদ অপচয় করে থাকেন। পার্টি-বিপ্লব-জনগণের স্বার্থে সকল ধরনের অপচয় আমাদের রোধ করা একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্য ভাইয়ার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের করণীয়। তাই, আসুন কমরেডগণ, সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে আমরা দৃঢ় মুষ্ঠিতে ভাইয়ার শিক্ষা আঁকড়ে ধরি ॥

***

কবিতা

আমিরি বারাকার
আলোচিত কবিতা

১৯৩৪ সালের ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন আমিরি বারাকা। জন্মসূত্রে তাঁর নাম ছিল এভাবে 'জিপিসিআর' ও এভারেস্ট *লে-রয় জোন্স। পরবর্তীতে তিনি আমিরি বারাকা নামধারণ করেন। তিনি নিউ জার্সির পোয়েট লরিয়েট ছিলেন অল্প সময়ের জন্য (২০০২-২০০৩)। ৯/১১-এর ঘটনার দশমাস পর ২০০২-এর জুলাই মাসে তিনি এই বিখ্যাত কবিতাটি লিখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শাসকশ্রেণী ও ইহুদিবাদীদের নিকট বিতর্কিত ও বিরাগভাজন হন। এই কবিতায় তিনি ৯/১১-এর ঘটনার জন্য আমেরিকার শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে ইহুদিবাদীদেরও দায়ী করেন । কবিতাটির ছত্রে ছত্রে তিনি শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী আমেরিকানদের অভিযুক্ত করে ঐতিহাসিক নানান ঘটনার উল্লেখ করেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই ১১টি, এ ছাড়াও তিনি আরো বেশ কিছু বই লিখেছেন, যার মধ্যে নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার কেন্দ্রে সর্বদাই নিপীড়িত কালোদের অধিকার এবং আমেরিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ২০১৪ সালের ৯ জানুয়ারি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ৯/১১-এর ঘটনার ওপর রচিত তাঁর সবচেয়ে আলোচিত কবিতা 'কেউ একজন উড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা'।*

মা-লে-মা ও সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের প্রশ্নে তাঁর সামগ্রিক জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, আমেরিকার নিপীড়িত কালো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শগত লড়াইয়ে তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবী। তাই মার্কিন শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণিকে উন্মোচন করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার মানবতাবিরোধী ঐতিহাসিক কুকর্মের উপস্থাপন করতে বাধ্য হন। যার শিকার শুধুমাত্র আমেরিকার কালোমানুষই নয়, সারা দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও নিপীড়িত জাতি-জনগণ। তাই কবির কাব্যিক প্রশ্নবান তার মতাদর্শের সীমা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতি-জনগণের যৌক্তিক হাতিয়ার। সেজন্য তার এই কবিতা সহযোদ্ধার পাঠকদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। এই কবিতায় কবি মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যাবাদের অপকর্মের বহু ঘটনা ও ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। যারা আমাদের কাছে পরিচিত নয়। পরিচিত না হলেও কবির উপস্থানা থেকে বোঝা যায় সেইসব ব্যক্তি উল্লেখিত অপকর্মের হোতা ।

– সহযোদ্ধা সম্পাদনা বোর্ড।

কেউ একজন উড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা

ওরা বলে কোনো এক সন্ত্রাসী,
এক অসভ্য বর্বর,
একজন আরব,
থাকে আফগানিস্তানে,
এটা আমাদের মার্কিন সন্ত্রাসীদের কাজ নয়
এটা গোত্র বা বর্ণ সন্ত্রাস নয়
নয় ওরা, যারা নিগ্রোদের ধর্মশালা উড়িয়ে দিত
অথবা নয় মৃত্যু সারিতে সেই পুনরুত্থানের গল্প
এটা ছিল না ট্রেন্ট লোট
অথবা ডেভিড ডিউক অথবা জুলিয়ানি
বা শান্ডলারের অবসরে যাওয়া মাত্র।

এটা ছিল না পোশাকের গণোরিয়া,
শ্বেতসড়কের সেই পুরনো অসুখ
যা কালোদের খুন করতো,
মানবতা, বিবেচনাবোধ
তাঁদের খুশির জন্যে ছিল সন্ত্রস্ত ।

ওরা বলে (কারা বলে?)
ওরা কারা যারা বলে
ওরা কারা যারা খেলছে

কারা মিথ্যে বলছে
কাদের গায়ে ক্যামোফ্লেজ?
কাদের ছিল ক্রীতদাস
খোসার ভেতর থেকে বের করে আনতো শস্য কারা

কারা ভোগ করতো চাষাবাদের ফল?
কারা গণহত্যা করেছিল ইণ্ডিয়ানদের,
কালোদের ফেলে দিতে চেয়েছিল আঁস্তাকুড়ে?

ওরা কারা ওয়াল স্ট্রিটে
শুষে নিচ্ছে পুঁজি, মানুষের রক্ত
কে তোমার সুপারি কাটে
কে তোমার মাকে ধর্ষণ করে
কে তোমার পিতাকে ফাঁসিতে ঝুলায়
কার হাতে ফাঁদ, কে খসায় পালক
কার হাতে দেশলাই, কে জ্বালায় আগুন
কে হত্যা করে এবং নিয়োগ দেয়
কে বলে, তারাই ঈশ্বর, প্রকৃত সত্য হচ্ছে তারা শয়তান।

কে বলে তারাই একমাত্র মহৎ
সবচেয়ে ভালো
যিশুর প্রতিকৃতি?

সবকিছু কারা বানিয়েছে?
কারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান?
সবচেয়ে ধনী কারা
কারা বলে যে তুমি কুৎসিত এবং শুধু তারাই সুদর্শন?

শিল্পের সংজ্ঞা কে তৈরি করে
কে দেয় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা
কারা বানায় বোম
কারা বন্দুক বানায়
কারা ক্রীতদাস এনেছিল এবং তাদের দিয়েছিল বেচে?

কারা বলে যে তাঁদের সুনাম করো
কারা বলে যে দাহমার বিকারগ্রস্ত ছিল না?

কারা? কারা? কারা?

কারা চুরি করেছে পোয়ের্তো রিকো?
কারা চুরি করেছে ইণ্ডিজ, ফিলিপিন্স, ম্যানহাটন,অস্ট্রেলিয়া দি হেব্রিডিস;
কারা চীনাদের হাতে তুলে দিয়েছে আফিম?

কে ওদের দালান গড়ে দিয়েছে
কার হাতে অর্থ
কে বলে তুমি অদ্ভূত, কিম্ভূতকিমাকার
কে তোমাকে জেলে পোরে
কার দখলে সংবাদপত্র?

কে ছিল সেই জাহাজের মালিক
যাতে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিত ক্রীতদাসদল
কে নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী?

কে নকল প্রেসিডেন্ট
কে শাসক
কে ব্যাংকার
কে? কে? কে?

কারা খনিগুলোর মালিক
কে তোমার মনকে বদলে দেয়
কে হয় রুটির মালিক
কে চায় শান্তি
কে যুদ্ধ চায় বলে মনে হয় তোমার?

তেলের মালিকানা কার হাতে
গায়ে খাটা শ্রম কার জন্যে নয়
জমির মালিক কে
কে নয় নিগ্রো

কে এত বড় যে তাঁর চেয়ে বড় আর কেউই নয়?
নগরসমূহের মালিক কারা
বাতাসের মালিক,
জলের একচ্ছত্র অধিপতি কে
তুমি কার দখলে

কারা করে যাচ্ছে দস্যুবৃত্তি, চুরি, জোচ্চুরি এবং খুন
এবং প্রতিনিয়ত সত্যকে বলে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য
আর তোমাকে বলে অসভ্য?

বড় বড় বিলাসী গৃহে কে বাস করে
কে করে পুকুর চুরি
যখন ইচ্ছে ছুটি কাটাতে যায় হাওয়াই দ্বীপে?

কারা হত্যা করেছে নিগ্রোদের
কারা হত্যা করেছে ইহুদিদের
কারা হত্যা করেছে ইতালিয়দের
আইরিশদের, আফ্রিকানদের, জাপানিজদের,
কারা, কারা হত্যা করেছে ল্যাটিনো মানুষ?

কারা? কারা? কারা?

কার করায়ত্বে আজ সমুদ্রের জলরাশি
উড়োজাহাজের মালিক কে
সুবৃহৎ একেকটি শপিং মলের মালিক কারা
টেলিভিশন, রেডিও আজ কার দখলে?

কার দখলে এতো এতো সম্পদ যা সে নিজেও জানে না
কারা আজ মালিকদের মালিক, যারা আদৌ মালিক নয়
মনোরম উপশহরগুলোর মালিক কারা
নগরের রক্ত চুষে খায় কারা
কারা তৈরি করে আইন?

বুশকে কে বানিয়েছে প্রেসিডেন্ট
কারা আজও স্বপ্ন দেখে কনফেডারেট পতাকার উড়াল
কারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে অথচ এ কেবলই প্রতারণা?

কারা পবিত্র গ্রন্থের পাশবিক কলঙ্ক
কারা ৬৬৬ শ্লোকের পশু
কারা জানে যে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কাদের?

প্রকৃতপক্ষে কে সেই শয়তান

যে আর্মেনিয়ান গণহত্যার সুবিধাভোগী?

কে বড় সন্ত্রাসী
কে বদলে দিয়েছে বাইবেল
কে খুন করেছে সবচেয়ে অধিক মানুষ মানবতা;
জগতের সকল অনিষ্টের মূলে কে
মানুষের বাঁচা-মরা কার হাতের খেলনামাত্র?

কাদের ছিল লুণ্ঠনের উপনিবেশ
কারা চুরি করেছে অন্যের ভূমি
কে শাসন করে এই ধরিত্রী
কে বলে যে তারাই দেবতা অথচ অহরহ
অবতীর্ণ হয় শয়তানের ভূমিকায়
কে এই জগতের সবচেয়ে বড় হত্যাকারী?

কে? কে? কে?
কে তেলখনিগুলোর মালিক
অথচ আরো, আরো তেল চাই
কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় সুন্দর স্বপ্নের
অথচ পরক্ষণেই আলিঙ্গন করো অধিকতর নিষ্ঠুর বাস্তব?

কে? কে? কে?
কে ঘোষণা করে বিন লাদেন এক শয়তান
কে সিআইএ-র অর্থের যোগানদাতা
কে জানতো যে বোমটা কখন ফাটবে
কারা জানতো সন্ত্রাসীরা ফ্লোরিডা, সান ডিয়েগোর উড়াল শিখেছে

কেউ কি জানে কেন পাঁচজন ইসরায়েলি
ধ্বংসযজ্ঞের ভিডিও করেছিল এবং
উত্তাপে গলে গলে পড়ছিল সুবৃহৎ স্থাপত্যটি?

কার দরকার আজ জৈব-জ্বালানি
যখন সূর্য আর ওঠে না পৃথিবীর অন্য কোনো ভূ-খন্ডে
ক্রেডিট কার্ড কারা বানায়
সবচেয়ে বেশি কে পায় আয়কর রেয়াত

বর্ণবাদ বিরোধী সম্মিলন থেকে ওয়াক আউট করে কে?
কে খুন করেছেন ম্যালকম, কেনেডি ও তাঁর ভাইকে
ড.কিং-এর হত্যাকারী কে, কাদের কাম্য ছিল এই হত্যাকান্ড?
তারা কি লিঙ্কন হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল?

কারা আক্রমণ করেছিল গ্রানাডা
কারা ফায়দা লুটে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে
আয়ারল্যান্ড কার ইশারায় উপনিবেশ
চিলি এবং নিকারাগুয়াকে কে অতঃপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো?

যারা মেরেছে ডেভিড সিবেকো, ক্রিস হ্যানিকে
তারাই হত্যা করেছে বিকো, ক্যাব্রেল, নেরুদা,
আলেন্দে, চে গুয়েভারা, সান্দিনোকে
যারা মেরেছে কাবিলাকে,
তারাই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে
লুমুম্বা, মন্দলানে, বেটি শাবাজ, ডিয়ে, রালফ ফেদারস্টোন,
লিটল ববিকে।

কারা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে
ম্যান্ডেলা, ধরুবা, জিরোনিমো, আসাতা, মুমিয়া, গার্ভি, দাশিয়েলহামেত,
আলফেউস হুটনকে ?
কারা হত্যা করেছে
হুয়ে নিউটন, ফ্রেড হ্যাম্পটন, ম্যাডগার এভারস, মিকি স্মিথ,
ওয়াল্টার রডনিকে ?
এরা কি তারা নয় যারা বিষ দিয়েছিল ফিদেলকে,
ভিয়েতনামে তৈরি করেছিল অসন্তোষ?

লেনিনের মাথার দাম কে ঘোষণা করেছিল?
কারা ইহুদিদের গ্যাস চুল্লিতে পুড়েছিল
এবং কারা তাঁদের সহযোগিতা করেছিল একাজে
কে বলেছিল ‘আমেরিকা প্রথম’ এবং ইশারা করেছিল হলুদ তারকাদের?

কারা হত্যা করেছিল রোজা লুক্সেমবার্গ, লিয়েবনেক্টকে
কে খুন করেছিল রোজেনবার্গকে
এবং আরো যত ভালো লোকদের কারা নির্যাতন,

অপহরণ এবং গুম করেছিল?

কারা ফায়দা লুটেছে
আলজেরিয়া থেকে লিবিয়া হাইতি, ইরান, ইরাক, সৌদি,
কুয়েত, লেবানান, সিরিয়া, মিশর, জর্দান, প্যালেস্টাইন থেকে?

কঙ্গোতে কারা মানুষের হাত কেটে নিচ্ছে
কারা আবিষ্কার করেছে এইড্‌স
কারা জীবাণু ছড়াচ্ছে আদিবাসীদের বিছানায়
কারা 'ট্রায়াল অব টিয়ারস' দিয়ে তাড়িয়েছিল ইণ্ডিয়ানদের?

কারা উড়িয়ে দিয়েছিল মেইন
এবং শুরু করেছিল স্পেনিশ-আমেরিকান যুদ্ধ
শ্যারনকে কে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে
বাতিস্তা, হিটলার, বিলবো,
চিয়াং কাইশেককে কে ইন্ধন যুগিয়েছিল?
কারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল
রি-কনস্ট্রাকশনের, নতুন ডিলের, নতুন ফ্রন্টিয়ারের,
দি গ্রেট সোসাইটির ?
টম অ্যাস কার হয়ে কাজ করেছিল
কার পাছায় হাগু আটকে ছিল
কে জানতো কন্ডোলিসা কতোবড় বেশ্যা
কার অর্থে কনের্লি হয়ে গেছে কাঠের নিগ্রো
হোমো লুকাস সাবসিডিয়ারকে
কারা জিনিয়াস এওয়ার্ড দিয়েছিল?

এনকোমা, বিশপকে কারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল
রবসনকে বিষ দিয়েছিল কারা
ডুবিঅসকে জেলে পুরতে চেয়েছিল কারা
কারা দোষী বানিয়েছিল র‍্যাপ জামিল আল আমিনকে,
রোজেনবার্গকে, গার্ভিকে এবং
দি স্কটিসবারো বয়েজ,
দি হলিউড টেনকে?
কে জ্বালিয়েছিল রাইখস্টাগ আগুন?

কে জানতো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বর্ষণ হবে
টুইন টাওয়ারের ৪,০০০ ইহুদি কর্মীকে
কে দিয়েছিল আগাম খবর বাড়ি থেকে না বেরুতে?
শ্যারন কেন বাইরে ছিল, কে জানে?

কে? কে? কে?
পেঁচার বিস্ফোরণ সংবাদপত্র বলে
পেঁচক-শয়তানের মুখ উন্মোচিত হবে।

কারা যুদ্ধ থেকে আয় করে অর্থ
কারা ভীতি এবং মিথ্যা দিয়ে রুটির ডো তৈরি করে
কারা চায় এমনি থাক পৃথিবী
কারা চায় এই ঔপনিবেশিক শোষণ থাকুক বহাল
এবং জাতিগত সংঘাত বেঁচে থাক,
বেঁচে থাক সন্ত্রাসবাদ
বেঁচে থাক সন্ত্রাসবাদ ক্ষুধা দারিদ্র?
কে এই নরকের শাসক
কে এই শক্তিধর শয়তান?
তুমি কি কাউকে চেন যে ঈশ্বর দেখেছে
কিন্তু শয়তান দেখেছে সকলেই
যেমন 'পেঁচার বিস্ফোরণ'
তোমার জীবনে, তোমার মস্তিষ্কে, তোমার মধ্যে,
এক পেঁচার মতো, যে চেনে শয়তানের মুখ,
সারারাত, সারাদিন, তুমি শুনতে থাকো
এক পেঁচকের বিস্ফোরণ ঘটেছে
আমরা স্পষ্টতই শুনতে পাই এক সুবৃহৎ প্রশ্নের মতো
পাগলা কুকুরের মতো তার স্বর-চিৎকার

এ যেন এক নরকের এসিড বমি
কে করে? কে?
এবং কারা এবং কাহারা, কাহারা, কাহারা
কাহারা..এবং কারা

***

বৈশাখের ডাক
(করোনা কড়চা)
– হাসান ফখরী

(কবিতাটি দেশের প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী হাসান ফখরীর কবিতা সংগ্রহ
"দেশটা কি তোর বাপের"থেকে সংগৃহীত।)

বগুড়া জেলার ধুনট থানার
গাজিয়া বাড়ি গ্রাম
কর্মহীন গরীব বৃদ্ধ
মমতাজউদ্দিন নাম।

উন্নয়নের সোনার ডিঙ্গায়
দেশ যখন যায় ভাসি
ক্ষুধার জ্বালায় সেই সে বৃদ্ধ
গলায় দিল ফাঁসি।

ট্যাক্স দিয়েছে ভ্যাট দিয়েছে
শ্রম দিয়েছে মেলা
কোথায় গেছে সে-সব এবার
হিসাব নেবার পালা।

পাই পাই পাই হিসাব নেবার
এলো যে বৈশাখ
হালখাতাটা রক্তে লেখার
শুনতে কি পাও ডাক?

***

গণমুক্তি গেরিলা বাহিনী

– আদিত্য

ক্লান্ত দিন যখন গভীর ঘুমে অচেতন
অন্ধকার ছড়িয়ে ....
সব শব্দকে ছুটি দেয় ঝিঁঝিঁ পোকা
অচেনা সুরে গান গায় ।

আমরা জেগে থাকি কান পেতে
অন্ধকারে গা ঘেঁষে।

নিম গাছ ঘিরে থাকে অসংখ্য জোনাকি, দূরে তারা।
আমরা গেরিলা যোদ্ধা,
রাতের অশ্রুসিক্ত আল স্বাগত জানায়।

গ্রাম পেরিয়ে মেঠোপথ;
ধানক্ষেত, আল, গ্রাম রাতে বিচরণ চলে।

প্রভাতে লাজুকলতার মতো
জনতার চাদরে মুড়িয়ে নিই নিজেদের।

ঝিনুক যেমন মুক্তাকে রাখে
তেমনি আমাদের রেখে চলেছে আজো।

জলের গভীরে যেমন মাছের মুক্ত বিচরণ
যেমন মায়ের কোলে থাকে নির্ভয়ে শিশু।
জনতার মাঝে তেমনি আমরা।
এ যেন গভীর মেলবন্ধন।

৩০/৯/২০১৯ ইং

কৌতুক/১

ঢাকার একজন বড় ডাক্তার পাবনার মানসিক হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলেন। গিয়ে দেখেন সব রোগীরা নিজের নিজের ঘর পরিষ্কার করছে। তাই দেখে ডাক্তার কৌতুহলবশতঃ পাগলকে জিজ্ঞেস করল :

ডাক্তারঃ ভাই, নিজের ঘর এত ভালভাবে পরিষ্কার করছো কেন?

পাগলঃ আমাদের চেয়ে বড় পাগল আসবে তো তাই।

ডাক্তারঃ

একটু চিন্তিত ভাবে আবার প্রশ্ন করল :

তোমাদের চেয়ে বড় পাগল আবার কে?

পাগলঃ দাঁত দু'পাটি বের করে হাসতে হাসতে উত্তর দিল –

কেন, ওবায়দুল কাদের!

ডাক্তারঃ

একটু মজা পেয়ে আবার প্রশ্ন করল – সেটা আবার কিভাবে ?

পাগলঃ যে মানুষ কয় আওয়ামী লীগ করোনাভাইরাসের চেয়ে শক্তিশালী, সে পাগল না তো কি ? জানেন তো পাগলে কি না কয়।

ডাক্তার মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে গেল।

কৌতুক/২

প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থেকে অন্য কেউ থাকলে বহু বেশি মানুষ মারা যেত। আওয়ামী লীগের কারণে অনেক কম মানুষ মারা গেছে।

<u>কৌতুক মন্তব্যঃ</u>

ওবায়দুল কাদের– আওয়ামী নেতা :

আমরা অনেক কম দুর্নীতি করেছি।

আসাদুজ্জামান কামাল– স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী :

আমাদের ছেলেরা অনেক কম ধর্ষণ করেছে।

***

গান

(১)

গণমুক্তি বাহিনী

[নোট: এই গানটি রচিত হয়েছিল সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে। তখন ৮৭/৮৮ সালে কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টির দেশব্যাপী একক সংগ্রামী উত্থান ঘটেছিল। তখন পার্টি মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পঁজিবাদ ও সামন্তবাদের শত্রুজোটকে সংক্ষেপে পাঁচশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।]

আহারে গণমুক্তি বাহিনী
অস্ত্র ধর যুদ্ধ কর
এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোলরে।

আমরা হলাম গণমুক্তি বাহিনী
থাকবো মোরা জনতারই পাশে।
জনতারে পুরান সমাজ উৎখাত করে
নতুন সমাজ গড়বো রে
এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোল রে ॥

রুখে দাঁড়াও বীর জনতা
এরশাদের ভাঙ্গো মাথা
মার্কিন যেন থাকেনা বাংলাতে
পাঁচ শত্রু পূর্ব বাংলার রক্ত চুইষা খায় রে
এরশাদের চক্রান্তে রে
এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোল রে ॥

স্বাধীন করবো পূর্ব বাংলা
থাকবে না আর শোষণ-নিপীড়ন
জনতারে পূর্ব বাংলার বেঈমান যারা মরবে
জনতার হাতে রে
এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোল রে ॥

(২)

সর্বহারা নামে বাংলায়

[নোট: এই গানটি কমরেড সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর সত্তরের শেষার্ধ থেকে আশির দশকে লেখা। এখানে চক্র-উপদল-ভাঙনের পরিস্থিতিতে কমরেড আনোয়ার কবীরের সারসংকলনের ভিত্তিতে পার্টি গঠন ও তার বিকাশের উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় গানটি পার্টির সংগ্রামী গ্রামাঞ্চলের নেতা-কর্মী ও সমর্থক জনগণের নিকট জনপ্রিয় ছিল। তখনও এসএস আমলের ধারাবাহিকতায় জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান বলা হতো। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল শাসকশ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে দালাল ও দেশপ্রেমিক হিসেবে সরলীকরণ করে দেখা হয়েছে। সেই বিচ্যুতিপূর্ণ অবস্থানের কারণে মুজিবের হত্যাকারী অবাধ্য সেনাদেরকে দেশপ্রেমিক আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে এসএস লাইনের সামগ্রিক সারসংকলন করে এইসব বিচ্যুতি দূরীভূত করা হয়েছে। বর্তমান লাইন অনুযায়ী ভাব ও ভাষা পরিবর্তন করে গানটি পরিবেশন করতে হবে।]

সভাপতি সিরাজ সিকদার
আজব এক কাম কইরাছে
সর্বহারা নামে বাংলার পার্টি বানাইছে ॥

পার্টি করিয়া গঠন
পূর্ববাংলার সর্বজায়গায় করেন সংগঠন
সেই পার্টির লাইগা মানুষ (ওরে)/২
সদাই জীবন দিতাছে (হায়রে)/২

বেঈমান শেখ মুজিবর
দেশপ্রেমিক সেনাদের হাতে হইল খতম
সেই সুযোগে মার্কিনীরা (ওরে)/২
বাংলা দখল কইরাছে (হায়রে)/২

সভাপতি শহীদ হইবার পর
আনোয়ার কবীর নতুন লাইন করেন প্রণয়ন
সেই লাইনে কৃষক-শ্রমিক (ওরে)/২
দলে দলে ভিড়তাছে (হায়রে)/২

(৩)

ভেদি অনশন মৃত্যু

(গানটি রুশ বিপ্লবের পর পরই সূচিত তিন বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধকালে লালফৌজের একটি প্রিয় সঙ্গীত ছিল)

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল,
কমরেড লেনিনের আহবানে
চলে মুক্তি সেনাদল।

Trough the winter cold and famine
From the fields and from the towns
At the call of Comrade Lenin
There arose the partisan.

অতিক্রান্ত ঐ প্রান্তর, গিরি দুর্গম
পূর্ব সীমান্তে ধায় পল্টন,
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে
আশ্রয় নিয়েছে দুশমন।

যুদ্ধ লাঞ্ছিত বিবর্ণ লাল পতাকা
মহাগৌরবে উর্ধ্বে উড্ডীন
সদ্য রক্তে সিক্ত
হলো সহস্র গুণ রঙীন।

চির স্মরণীয় ইতিহাসে সেই মহাদিন
নিখিল বিশ্বে সে কাহিনী প্রচার,
মহাবিক্রমে লাল পল্টন
শেষ দুর্গ করে অধিকার।

নিশ্চিহ্ন হলো শত্রু সৈন্য
জাহান্নামে দস্যু বিলীন
প্রশান্ত সাগর তীরে
শ্রমিক পতাকা উড্ডীন।

***

(৪)

দুনিয়ার মজদুর ভাইসব

(এ গানটি আদি কমিউনিস্ট পার্টিকালে রচিত হয়)

দুনিয়ার মজদুর ভাইসব
তোরা এক মিছিলে দাঁড়া
নয়া জমানার ডাক এসেছে (২)
একসাথে দে সাড়া।

(এই) কলে কারখানাতে
আর ক্ষেতে-খামারেতে
মোরা খেটে মরি না পাই খেতে
না পাই থাকার ঘর।।
তাই খুনে রাঙ্গা ঐ লাল ঝান্ডা
শক্ত হাতে ধর।।

(মোরা) গোলামীর জিঞ্জির ভাঙবোই
ভাঙবোই ভাঙবোই ভাঙবোই
(মোরা) মজলুম মজদুর ঘরে ঘরে
আশার মশাল জ্বালবোই।

তাতে মিলবে রুটি ভাত
আর মিলবে থাকার ঘর
মোদের আসবে নতুন দিন
তাই বিপ্লবের ঐ লাল ঝান্ডা
শক্ত হাতে ধর।।

***